অভিষেক মিত্র

কোডেক্স ইয়োকাই

জাপানের উপকথায় ভূত



উপকথার ভৌতিক কাহিনী নিয়ে চিন্তা শুরু করলে প্রথমেই মাথায় আসে 'জাপান' নামক অদ্ভুত দেশটির কথা। জাপানের উপকথার একটি বিশেষ দিক মনে করলেই এই 'অদ্ভুত' শব্দটি মাথায় স্থান করে নেয়। জাপানের উপকথা জুড়ে সাধারণ থেকে অতি সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করেও ছড়িয়ে আছে এক একটি ভৌতিক উপাখ্যান। তা সে কোনো বিশেষ পাথরই হোক বা প্রাচীন পুঁথি বা স্ক্রোল। জাপানের ইতিহাসের বীরগাথার সঙ্গে এই অলৌকিকতার মিশ্রণে সে-দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই ভৌতিক উপকথা এবং লোকগাথার একটা ছোট নির্যাসকে একত্রিত করে রচিত 'কোডেক্স ইয়োকাই' বইটি। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত রয়েছে লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণা। 'কোডেক্স' শব্দের অর্থ একপ্রকার পুঁথি আর জাপানী ভাষার দুটি শব্দ 'ইয়ো' এবং 'কাই' জুড়ে গঠিত হয়েছে 'ইয়োকাই'। এই 'ইয়োকাহ' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে লেখক বইয়ের শুরুতেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তার পরে রয়েছে একের পর এক অদ্ভুত সব তথ্যনির্ভর ভূত-পিশাচ-আরবান লেজেন্ডদের কাহিনী।

কোডেক্স ইয়োকাই

কোডেক্স ইয়োকাই

অভিষেক মিত্র

পালক পাবলিশার্স

CODEX YOKAI
Collection of Articles About Ghost

by Avishek Mitra

Published by **Palok Publishers**
Kolkata-700007

facebook.com/PalokPublishers
publisherspalok@gmail.com
+91-94333-20612/13

ISBN : 978-93-94254-20-6

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রিয় চক্রবর্তী

কলেজস্ট্রিটে
পালক পাবলিশার্স, রুম নং-৩০৯, ৯০/৬এ, এম.জি. রোড
(কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে)
কলকাতা-৭০০ ০০৭

Online Store : www.PalokPublishers.com
Flipkart & Amazon

২৮০.০০

মা ও বাবা-কে

সম্পাদকীয়

২০২১ সালে ''দেশ বিদেশের ভূত'' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর নানান বয়সের বেশ কিছু পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সেই বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কৌতূহল ছিল বেশ লক্ষ্যনীয়। যা পরবর্তীকালে আমাদের আরও ভাবতে বাধ্য করে। বিষয় নির্বাচনে বেশী সময়ও লাগেনি। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কোন একটি বিশেষ দেশের উপকথার ভৌতিক কাহিনী হোক আমাদের পরবর্তী বইয়ের বিষয়বস্তু। আর উপকথার ভৌতিক কাহিনী নিয়ে চিন্তা শুরু করলেই প্রথমেই মাথায় আসে ''জাপান'' নামক অদ্ভুত দেশটির কথা।

''অদ্ভুত'' শব্দটির ব্যবহার কিন্তু এতো সুন্দর দেশটিকে বিবরণ করার জন্য নয়। জাপানের উপকথার একটি বিশেষ দিককে মনে করলেই এই শব্দটি মাথায় স্থান করে নেয়। আর তা হবে না-ই বা কেন বলুন! জাপানের উপকথা জুড়ে সাধারণ থেকে অতি সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করেও জড়িয়ে আছে এক একটি ভৌতিক উপাখ্যান। তা সে কোন বিশেষ পাথরই হোক বা প্রাচীন পুঁথি বা স্ক্রোল। জাপানের ইতিহাসের বীরগাথার সাথে এই অলৌকিকতার মিশ্রণে সে দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি হয়েছে সমৃদ্ধ।

এই ভৌতিক উপকথা এবং লোকগাথার একটা ছোট নির্যাসকে একত্রিত করে রচিত এই ''কোডেক্স ইয়োকাই'' বইটি। এর সাথে অবশ্যই যুক্ত রয়েছে লেখক শ্রী অভিষেক মিত্র মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণা। কোডেক্স শব্দের অর্থ একপ্রকার পুঁথি আর জাপানী ভাষার দুটি শব্দ 'ইয়ো' এবং 'কাই' জুড়ে গঠিত হয়েছে ''ইয়োকাই''। এই ''ইয়োকাই'' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে লেখক বইয়ের শুরুতেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তার পরে রয়েছে একের পর এক তথ্য নির্ভর ভূত-পিশাচ-আরবান লেজেন্ডদের কাহিনী।

আমার বিশ্বাস ''কোডেক্স ইয়োকাই'' বইটি পাঠকদের মনে কিছুটা জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে। আমাদের পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে পাঠককূলের প্রতিক্রিয়া লাভের পরেই।

- স্নেহাদ্রি শেখর দাশ

সূচিপত্র

শুরুর কথা

ইয়োকাই কি?

খুব সহজ ভাষায় বললে ইয়োকাই হল জাপানী উপকথার অতিপ্রাকৃতিক প্রাণী। জাপানী ভাষায় ইয়োকাই শব্দটা এসেছে 'ইয়ো' আর 'কাই' শব্দের মিলনে। 'ইয়ো' শব্দটির মানে হল সম্মোহক আর 'কাই' শব্দটির মানে হল অদ্ভুত। তবে এই 'ইয়োকাই' বলে যে সব প্রানীদের কথা বলা হয়, তারা সবাই কিন্তু দানবাকার প্রাণী নয়। এদের মধ্যে অনেকেই আছে 'কামি' বা দেবতা, প্রেত বা 'বাকেমোনো', অলৌকিক জীব, মানুষ থেকে পরিবর্তিত হওয়া প্রাণী ইত্যাদি।

কোথা থেকে এসেছে এই ইয়োকাই'রা?

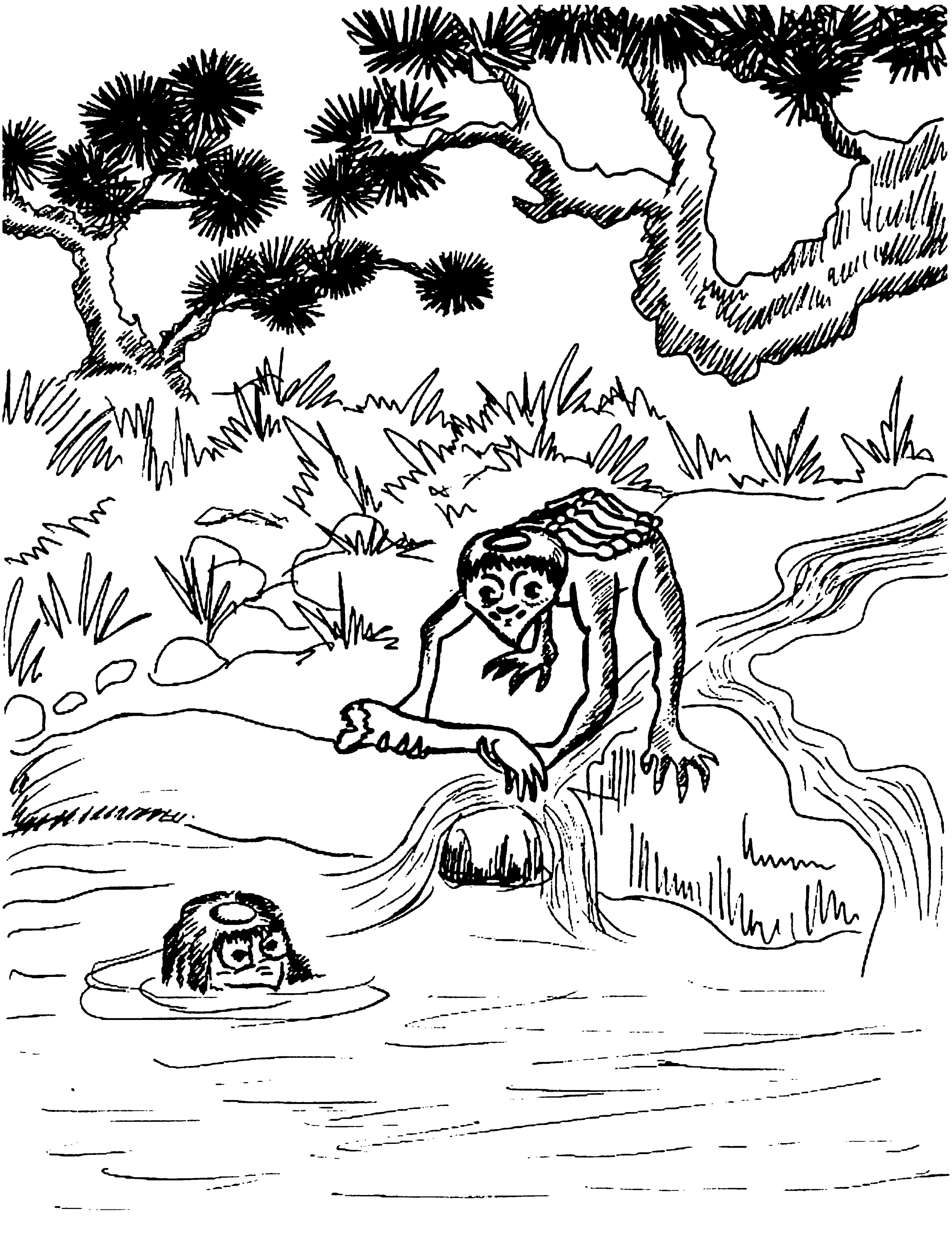
জাপানি পৌরাণিক কাহিনী হল বিভিন্ন ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। এই কাহিনীর ভিত্তি হল জাপানের বিভিন্ন দ্বীপ জুড়ে বসবাসকারী বিচ্ছিন্ন উপজাতিদের লোকধর্ম। পরবর্তীকালে সেই সব উপজাতির ধর্ম আর লোকগাথা একত্রিত হয়ে স্থান পায় 'শিন্টো' ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীতে। চীন আর ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মের আগমনের পর সেই সব স্থানের কিছু উপকথাও যোগ হয় জাপানের পৌরাণিক কাহিনীতে।

জাপানের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এই ইতিহাসের লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় অষ্টম খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এইসব পুঁথিতে লেখা আছে পৌরাণিক মতে কিভাবে গঠন হয়েছিল পৃথিবী, কিভাবে মানুষ এসেছিল সময়ের সাথে। এখানে লেখা আছে সেই প্রাচীন জাপানের সম্রাটদের কাহিনী। এইসব কাহিনীতে বলা হয়েছে কিভাবে এই সম্রাটরা সবাই প্রায় বিভিন্ন দেবতার অংশ। এরপর আস্তে আস্তে সেই সব পুঁথিতে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন উপকথা আর সেই উপকথায় বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন অলৌকিক প্রাণী আর দানবের কথা।

সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জাপানে সংস্কৃতি আর শিল্পের বিপুল বিকাশ ঘটতে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দানবদের গল্প এবং অদ্ভুত ঘটনার সাথে ভূতের গল্পগুলিও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। এই সময় বিভিন্ন উপকথার জীবদের কাহিনী একত্রিত করেন বিখ্যাত উপকথাবিদ 'তোরিয়ামা সেকিয়েন' আর 'সাওয়াকি সশি'। এনারা জাপানের বিভিন্ন অংশ থেকে এইসব মৌখিক কাহিনী একত্রিত করে সেই সব উপকথা থেকে নতুন নতুন কাহিনী লিখতেও শুরু করেন। যার ফলস্বরূপ এইসব প্রাণী আর দানবদের কাহিনী জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে শহুরে জাপানী মানুষদের কাছেও। ইয়োকাই'দের নিয়ে প্রথম কাহিনী শুরু হয় রঙিন স্ক্রোল হিসেবে আর পরে সেই নিয়ে একাধিক কাহিনী আর কমিক লিখে গেলেন জাপানের বিশিষ্ট লেখক ও চিত্রকররা।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় ইয়োকাই'য়ের কাহিনী। তবে আবার বিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জাপানী চিত্রকর 'মিজুকি শিগেরু'-র হাত ধরে ফিরে আসে ইয়োকাই'দের কাহিনী। ওনার লেখা 'গেগেগে নো কিতারো' নামক কমিকের হাত ধরে ধীরে ধীরে ফিরে আসে প্রাচীন উপকথার জীবেরা আর সেই সাথেই আবার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই অলৌকিক প্রাণীদের আকর্ষণ। মিজুকির চিত্রের মাধ্যমে জাপানে আবার ফিরে আসে এই সব প্রাচীন জীবদের কাহিনী। এই কাহিনীগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যায় জাপানের সংস্কৃতির একটা অংশ। পরবর্তীকালে এই ইয়োকাই'দের কাহিনী পাওয়া গেছে বিভিন্ন জাপানী বইতে; 'উবুমে' বা 'কিতসুন'-এর মত প্রাণীরা ফুটে উঠেছে ছায়াছবির পর্দায়।

আজ, জাপানি সংস্কৃতি যত বেশি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, ততটাই বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে 'কাপ্পা', 'কিজিমুনা' আর 'আকানাম'-এর মত 'ইয়োকাই'রা।



কাপ্পা

১. কাপ্পা

ভাষান্তর- নদীর শিশু।

অন্যান্য নাম- কাওয়াতারো, কাওয়াকো।

আবাস- নদী, হ্রদ, পুকুর, কুয়ো; এদের কাহিনী পাওয়া যায় সমগ্র জাপান জুড়ে।

খাদ্য- এরা সর্বভোজী, তবে শসা আর মানুষের অন্ত্র হল এদের প্রিয় খাবার।

চেহারা-

কাপ্পা হল এক জাতীয় জলজ, উভচর প্রাণী যারা যে কোন প্রকার জলাশয়ে বসবাস করে। এরা উভচর হলেও, ডাঙার থেকে জলেই এরা বেশি স্বচ্ছন্দ। এদের শরীর হয় ছোট তবে এদের দৈহিক শক্তি একজন প্রাপ্তবসস্ক মানুষের থেকেও বেশ খানিকটা বেশি হয়।

এদের আঁশযুক্ত ত্বকের রঙ হয় ভিন্ন; সবুজ থেকে উজ্জ্বল লাল এবং এমনকি নীল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের শরীরটাও জলজ প্রাণীর মতই। এদের হাত আর পায়ের আঙুলগুলো হয় ব্যাঙের মত আর এদের পিঠে থাকে কচ্ছপের কত একটা কুঁজ বা খোল। এদের মুখটাও হয় অনেকটা কচ্ছপের মত আর এদের ত্বক হয় মাছের মত আঁশযুক্ত।

এছাড়াও এদের থাকে তিনটে পায়ুদ্বার, যার ফলে এরা মানুষের থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি বায়ু ত্যাগ করতে সক্ষম। এদের পিঠের কুঁজ বা শক্ত কাঠামোটার মধ্যে এদের হাত দুটো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে, তাই এরা ইচ্ছেমত একটা হাত ছোট আর অন্য হাতটি লম্বা করতে পারে।

তবে এদের শরীরের সব থেকে অদ্ভুত জিনিসটা থাকে এদের মাথায়। এদের ব্রহ্মতালুটি হয় একটা বাটি আকারের। এই বাটিটাই হল কাপ্পাদের শক্তির উৎস। যতক্ষণ এই বাটিতে জল থাকবে, ততক্ষণ কাপ্পাদের চলনশক্তি থাকবে। একবার এই জল মাটিতে পড়ে গেলে কাপ্পারা চলনশক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই জল সম্পূর্ণ ভাবে শুকিয়ে গেলে কাপ্পারা মারাও যেতে পারে।

স্বভাব-

কাপ্পারা একাকী জীবন কাটাতে ভালোবাসে, তবে শিশু কাপ্পারা সাধারণত তাদের পরিবারের সাথেই চলাফেরা করে। তবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাহিনীতে দেখা যায় যে একটি কাপ্পা অন্য একটি অদ্ভুত জীব বা প্রেতের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আবার কোন কোন কাহিনীতে এদের বন্ধু হয়ে থাকে কোন মানব। যেহেতু এরা প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত হয়, তাই এই কাপ্পারা খুব সহজেই মানুষের ভাষা শিখে নিতে পারে। এছাড়াও কাপ্পাদের থাকে ঔষধির ব্যাপারে বিস্তর জ্ঞান। কিছু উপকথা অনুযায়ী, কাপ্পারা এই জ্ঞান দান করেছিল মানুষদের।

মানুষের মুখোমুখি-

জাপানের শিন্টো ধর্ম মতে কাপ্পারা হল এক ধরণের জলজ দেবতা। তাই জাপানের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় মানুষ কাপ্পাদের উদ্দেশ্যে শসা দান করে নদীর জলে। এর বিনিময়ে কাপ্পারা বিভিন্ন ভাবে মানুষের সাহায্য করে। তবে সব কাপ্পা ভালো হয় না। বিভিন্ন কাহিনীতে আমরা বেশ কিছু দুষ্ট কাপ্পার উল্লেখও পাই। এই কাপ্পারা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন গবাদি পশুকে অকারণেই আক্রমণ করে। এছাড়াও এরা মানুষের ভিড়ে গিয়ে নিজেদের দেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আসে এবং নারীদের পোশাকের মধ্যেও উঁকি দিতে ছাড়ে না। কিছু কিছু কাপ্পা একটু বেশিই হিংস্র হয়। এরা নদীতে সাঁতার কাটতে আসা নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করে। এছাড়াও নদীতে স্নান করতে আসা মানুষদের জলের তলা থেকে কামড়ে ধরে মেরে ফেলে। কিছু কাহিনীতে জানা যায় যে কাপ্পারা কখনও কখনও জ্যান্ত মানুষকেও খেয়ে ফেলে। তবে এরা সাধারণত মানুষের পায়ুদ্বারে অবস্থিত 'শিরিকোডামা' নামক মাংসটা খেতে সব থেকে বেশি ভালোবাসে। জলের মধ্যে এই কাপ্পার হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, তবে ডাঙায় এই কাপ্পাদের খুব সহজেই বোকা বানানো যায়। জাপানী মতে এই কাপ্পাদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম অভিবাদন করলে এরাও মাথা নত করে অভিবাদন করে। যার ফলে এদের মাথার বাটি থেকে জল মাটিতে পড়ে যায় আর এরা চলনশক্তি হারিয়ে ফেলে।

২. গারাপ্পা

ভাষান্তর- কাপ্পার স্থানীয় সংস্করণ।

অন্যান্য নাম- গাওয়াপ্পা।

আবাস- নদী, হ্রদ, পুকুর, ঝর্ণা; এদের কাহিনী পাওয়া যায় বিশেষ করে ক্যুশু প্রদেশে।

খাদ্য- এরা সর্বভোজী।

চেহারা-

গারাপ্পা হল জাপানী মতে এক ধরণের জলজ আত্মা যাদের কাহিনী পাওয়া যায় দক্ষিণ জাপানের ক্যুশু এলাকায়। এদের সাথে কাপ্পাদের বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে, যার ফলে অনেক জায়গাতেই কাপ্পা আর গারাপ্পার কাহিনী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবে এদের দুজনের মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে। গারাপ্পাদের হাত পা হয় কাপ্পাদের থেকে একটু বেশীই লম্বা।

এদের পা এতটাই লম্বা হয় যে এরা মাটিতে বসলে এদের হাঁটু এদের মাথা ছাড়িয়ে চলে যায়। এই লম্বা পায়ের জন্য, গারাপ্পারা কাপ্পাদের থেকে বেশ খানিকটা লম্বাও হয়। এছাড়াও এদের মুখটাও হয় বেশ খানিকটা লম্বাটে।

স্বভাব-

এরা কাপ্পাদের মত জনসমক্ষে আসতে পছন্দ করে না। এরা বসবাসের জন্য বেছে নেয় জনমানবহীন শান্ত পাহাড়ি পরিবেশ। এরা ছোট ছোট দলে থাকতে ভালোবাসে। আর যেহেতু এরা মানুষের সামনে আসতে পছন্দ করে না, তাই এদের দেখেছে এমন

মানুষের সংখ্যাও খুব কম। তবে এদের ডাক নাকি অনেক মানুষই শুনেছে। এরা ডাকলে 'হ্যো হ্যো' বা 'ফুন ফুন' শব্দ হয়।

মানুষের মুখোমুখি-

কাপ্পাদের মত গারাপ্পাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক একই রকম। এরা একক মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করে। এছাড়াও এরা বিভিন্ন ভাবে পথচারীদের পথভ্রষ্ট করে। কাপ্পাদের মতই এরা অসম্ভব শক্তিশালী হয় যার ফলে একজন মানুষকে এরা সহজেই যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে। কিছু কিছু গারাপ্পা একক নারীদের দেখলে ধর্ষণ করতে ছাড়ে না। তবে এরা কোন মানুষকে কথা দিলে সেই কথা মতই এরা কাজ করে। যদি কোন মানুষ এদের যুদ্ধে পরাজিত করে, তাহলে সেই মানুষের কথা অনুযায়ী, এরা মানুষের ক্ষতি করা বন্ধও করে দেয়।

৩. হ্যোসুবে

ভাষান্তর- যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত।

অন্যান্য নাম- হ্যোসুই, হ্যোসুবো, হ্যোসুনবো, হ্যোসুনবে।

আবাস- নদী, ঝর্ণা; এদের কাহিনী পাওয়া যায় বিশেষ করে পশ্চিম জাপানের ক্যুশু সম্প্রদায়ে।

খাদ্য- এরা সর্বভুক, এদের প্রিয় খাদ্য হল বেগুন।

চেহারা-

এই বেঁটে, লোমোশ প্রাণীদের কাহিনী পাওয়া যায় দক্ষিণ আর পশ্চিম জাপানের বিভিন্ন স্থানে। কাপ্পা আর গারাপ্পার সাথে যুক্ত এই প্রাণীরা হিয় অনেক বেশি হিংস্র। দৈহিকভাবে এরা হয় বেঁটে, এদের মাথায় কেশ থাকে না, এদের হাতে থাকে ধারালো নখ আর মুখের ভীতর থাকে ছুঁচালো দাঁতের সারি। এদের সারা শরীর ঢাকা থাকে লোম যুক্ত শক্ত চামড়ায়। এদের লোমগুলো এতটাই ঘন হয় যে সেই লোমে আটকে থাকে নোংরা, ঘাস পাতা ইত্যাদি। হ্যোসুবেরা এদের দেহের চামড়া ইচ্ছে মত খুলে ফেলতে সক্ষম। এদের মুখ দিয়ে এরা একটা 'হ্যো হ্যো' করে শব্দ করে আর সেই শব্দ থেকেই এদের নাম হয়েছে হ্যোসুবে।

স্বভাব-

এরা সাধারণত বসবাস করে নদীর ধারে। এরা সেই নদী থেকে মাছ ধরে খায় আর পারতপক্ষে মানুষের সন্মুখে আসে না। এদের প্রিয় খাবার হল বেগুন আর এরা মুহূর্তের মধ্যে গোটা বেগুন ক্ষেত খেয়ে ফেলতে পারে। এরা অপন্দের জিনিস হল ঘোড়া।

মানুষের মুখোমুখি-

হ্যোসুবে নামক প্রাণীটা হল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কোন মানুষ যদি এই প্রাণীটিকে একবার দেখে ফেলে, তাহলে সে ভুগতে থাকে প্রচণ্ড জ্বরে। সেই জ্বর আবার ছোঁয়াচে। কয়েক দিনের মধ্যে সেই জ্বর ছড়িয়ে পড়ে সম্পূর্ণ এলাকায়। এছাড়া এই হ্যোসুবেদের হাসিও ছোঁয়াচে। কোন মানুষ এই হাসি শুনলে সেও হ্যোসুবেদের মত হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে জ্বর আসে আর কিছু দিনের মধ্যে সে মারা যায়।

এই হ্যোসুবেদের একটা প্রিয় জিনিষ হল বাথ-টব। এরা রাতের বেলায় মানুষের বাড়ির মধ্যে উঁকি দেয় আর সেখানে কোন বাথ-টব দেখলে তারা আর নিজেদের সামলাতে পারে না। সেই বাথ-টবে স্নান করে তারা তাদের দেহের চামড়ার একটা অংশ রেখে আসে। আর প্রতিদিন সেখানে আসতে থাকে। কখনও যদি সেই বাড়ির মালিক সেই নোংরা বাথ-টব পরিষ্কার করে ফেলে, তাহলে তার উপর বর্ষিত হয় হ্যোসুবের ক্রোধ। সেই পরিষ্কার করা লোম আর নোংরা কোন প্রাণীকে স্পর্শ করলে সেই প্রাণীর মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ।

অন্য একটা কাহিনী অনুযায়ী, একবার একজন গ্রাম্য মহিলা রাতের বেলা জেগে তার বেগুন ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিল। সেই রাতে সে দেখে ফেলে যে একদল হ্যোসুবে সেই বেগুন ক্ষেতে এসেছে। পরের দিন সকালে সেই মহিলার সারা দেহ বেগুনী রঙে পরিণত হয় আর কয়েক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

তবে কিছু শিন্টো মন্দিরে এই হ্যোসুবেদের যুদ্ধের দেবতা রূপে পুজো করা হয়। কোন কোন গ্রামের কৃষকরা তাদের ক্ষেতের রক্ষার জন্য হ্যোসুবেকে বেগুনের ভোগ উৎসর্গ করে।

৪. কিরিন

ভাষান্তর- কোন ভাষান্তর নেই।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- জ্ঞানী আর দয়ালু নেতা দ্বারা পরিচালিত প্রদেশে।

খাদ্য- এরা তৃণভোজী।

চেহারা-

কিরিন হল পূর্ব এশিয়ায় পরিচিত বিরলতম, ভয়ঙ্কর এবং শক্তিশালী প্রাণীদের মধ্যে একটি। এটি একটি রাজকীয় প্রাণী, পবিত্র এবং অত্যন্ত সম্মানিত। এই প্রাণীটিকে অনেক সময় দেবতার আসনেও বসানো হয়। কিরিনদের দেহ হরিণের মত তবে এদের সারা শরীর জুড়ে থাকে ড্রাগনের মত আঁশ। এর ল্যাজ হয় ষাঁড়ের মত আর কেশর থাকে সিংহ-এর মত। এদের শরীর আর কেশর থেকে বেরিয়ে আসে রক্তিম পবিত্র আগ্নিশিখা।

স্বভাব-

কিরিন কখনও কোন পশুর মাংস ভক্ষণ করে না। শুধু তাই নয়, এরা কোন জীবিত প্রাণীর ক্ষতি পর্যন্ত করে না, এমনকি কোন পোকার উপর পা পর্যন্ত দেয় না। যখন এরা হেঁটে যায়, তখন এরা একটি তৃণ পর্যন্ত মাড়িয়ে চলে না। এই প্রাণীটির দেখা পাওয়া যায় শুধু মাত্র বিশ্ব শান্তির ক্ষণে। অশান্ত নগরে কিরিনের কোন অস্তিত্ব নেই। এরা সেই সব স্থানেই থাকে যেখানকার রাজা সৎ আর দয়ালু।

যদিও কিরিন কোন মানুষের ক্ষতি সাধন করে না, তবুও তাকে কেউ আক্রমণ করলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে পবিত্র আগ্নি।

মানুষের মুখোমুখি-

যেহেতু কিরিন একটি পবিত্র প্রাণী, তাই প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন গুহাচিত্র এবং পুঁথিতে পাওয়া যায় কিরিনের ছবি আর বর্ণনা। এদেরকে জ্ঞান আর ন্যায়ের প্রতিরূপ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এদের পবিত্রতার কারণেই বিভিন্ন মন্দিরের দেওয়ালে কিরিনদের চিত্র পাওয়া যায়। কোন স্থানে কিরিনের দর্শন সেই সময় সেই প্রদেশে কোন এক সৎ, প্রজাদরদি নেতার আবির্ভাবের আগাম বার্তা বহন করে।

৫. হোও

ভাষান্তর- কোন ভাষান্তর নেই।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- এরা বসবার করে পাউলোনিয়া নামক একটি গাছে। এরা সেই সব স্থানেই থাকে যেখানে শান্তি আর সমৃদ্ধি আছে।

খাদ্য- এরা শুধুই বাঁশ গাছের বীজ খায়।

চেহারা-

হোও হল এক ধরণের অতীব সুন্দর, শান্তিপ্রিয় পক্ষী যাদের পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেবী রূপে পুজো করা হয়। এদের ঠোঁট হয় মুরগির, মাথা হয় তিতির পাখির, গলা হয় সর্পের, পিঠে থাকে কচ্ছপের মত শক্ত কুঁজ, পা হয় বকের মত আর ল্যাজ হয় ময়ূরের মত। এদের ল্যাজের পালকগুলো হয় পাঁচটা রঙের- সাদা, কালো, লাল, হলুদ আর নীল।

স্বভাব-

হোও হল শান্তির প্রতীক আর সেই জন্যেই এরা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে না। এরা শুধু বাঁশ গাছের বীজ খায় আর বসবাস করে পাউলোনিয়া নামক গাছে। বলা হয়, যখন হোও উড়ে বেড়ায়, তখন বাতাসও শান্ত হয়ে যায়, উড়ন্ত ধূলিকণাও ঝরে পড়ে মাটিতে। সেই সাথে এক অপার শান্তি বিরাজ করে পশু পাখিদের মাঝে।

এদের পবিত্রতার কারণেই, এরা শুধু বসবাস করে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ রাজ্যে। অশান্তির

সময়, এরা উড়ে চলে যায় স্বর্গে। আবার সেই অশান্তির শেষে শান্তি এলে আবার এরা সেই শান্তির দূত রূপে ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে।

মানুষের মুখোমুখি-

জাপানি চিত্রকলা, কারুশিল্প, কিমোনো এবং মন্দির ও উপাসনালয়ের নকশায় হোও একটি জনপ্রিয় বিষয়। হোও-এর চিত্র বিশেষ করে আগুন, সূর্য এবং রাজকীয় পরিবারের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও হোও-কে কর্তব্য, বিশ্বাস এবং করুণার প্রতীকও বলা হয়। এদের পালকের পাঁচটা রং আসলে পঞ্চভূতের প্রতীক।

৬. তাতসু

ভাষান্তর- ড্রাগন।

অন্যান্য নাম- রু, রো, ওয়ানি।

আবাস- নদী, জলপ্রপাত, পাহাড়, হ্রদ, সমুদ্র।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

তাতসু হল জাপানের ড্রাগন। এদের চেহারার সাথে চীনের ড্রাগনের কোন ভিন্নতা নেই। এদের শরীর হয় লম্বা আর সেই শরীর ঢাকা থাকে আঁশে। এদের ল্যাজ হয় সর্পের মত লম্বা আর পায়ে থাকে লম্বা নখ। এদের মাথায় থাকে এক জোড়া শিং।

কিছু কিছু তাতসু'র চারের বেশি হাত-পা থাকে আবার কারুর থাকে একাধিক মাথা। তবে বেশীরভাগ তাতসু মানুষের রূপ ধরে থাকে, তাই এদের আসল রূপ বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় না।

স্বভাব-

তাতসুদের সাথে জলের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। তাই অনেক জায়গাতে এদের জলের দেবতাও বলা হয়। এরা সাধারণত সমদ্রের তলায় বিরাট প্রাসাদে বসবাস করে। এদের বাসস্থান মানুষের জগত থেকে অনেক দূরে থাকে, তবে কিছু কিছু তাতসু কোন বৌদ্ধ মঠের পাশেও মানব রূপে বসবাস করে। এদের বাড়িতে রক্ষিত থাকে একাধিক মূল্যবান ঐন্দ্রজালিক বস্তু। তাছাড়া ধন সম্পদের রক্ষাও এরা করে থাকে।

কাহিনী অনুযায়ী, কিছু কিছু তাতসু আবার বিভিন্ন উপকথার নায়কদের সাহায্য করেছে বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক বস্তু দান করে।

মানুষের মুখোমুখি-

তাতসুরা মানব জীবনের থেকে অনেক দূরে বসবাস করতেই ভালোবাসে। এরা সাধারণত মানুষের জীবনে হস্তক্ষেপ করে না। তবে এরা মানুষের থেকে পুজো পেয়ে থাকে। এদের জন্য স্থাপিত হয়েছে একাধিক মন্দির। জাপানিরা তাতসু'র পার্বত নামক একটি পবিত্র পাহাড়ে প্রতিবছর পুজো দিতে যায়।

মানুষরা বিশেষ করে বৃষ্টির জন্য অথবা বন্যা থেকে বাঁচার জন্য তাতসু'র পুজো করে।

৭. বাকু

ভাষান্তর- কোন ভাষান্তর নেই।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- গভীর জঙ্গলের ভিতর।

খাদ্য- দুঃস্বপ্ন।

চেহারা-

বাকু হল জাপানী উপকথার একটি অদ্ভুত দর্শন পবিত্র প্রাণী। এদের শরীরটা হয় ভল্লুকের, মাথাটা হাতির, চোখ গণ্ডারের, ল্যাজ ষাঁড়ের আর পা হয় বাঘের। দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও, বাকু'কে পবিত্র শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এদের মানব জাতির রক্ষাকর্তাও বলা হয়।

পৌরাণিক কাহিনীর অনুযায়ী, যখন ঈশ্বররা প্রাণীর সৃষ্টি করছিলেন, তখন বিভিন্ন প্রাণীর পড়ে থাকা অঙ্গ দিয়ে তৈরি করেছিলেন বাকুদের। এখান থেকেই জানা যায় বাকুদের অদ্ভুত রূপের ইতিহাস।

স্বভাব-

বাকুরা মানুষের জীবনের উপর নজর রাখে আর তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবেও কাজ করে। বাকুদের খাদ্য হল মানুষের দেখা দুঃস্বপ্ন। দুরাত্মা আর প্রেতেরা বাকুদের প্রচণ্ড ভয় পায়। যে স্থানে বাকু থাকে, সেখানে কোন প্রেত থাকে না। সেই কারণে, যেখানেই বাকু যায়, সেখানেই ছড়িয়ে পরে পবিত্রতা আর শান্তি।

মানুষের মুখোমুখি-

প্রাচীন জাপানী উপকথায়, বাকুর নাম আর চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে। প্রাচীন কালে বালিশের উপর বাকুর চিত্র এঁকে রাখা হত। তাদের বিশ্বাস ছিল, বাকুর চিত্রওয়ালা বালিশে ঘুমালে দুঃস্বপ্ন, ব্যাধি কিংবা দুরাত্মারা কাছে আসতে অক্ষম হয়। এছাড়াও, মন্দিরের দরজার উপরেও বাকুর চিত্র খোদাই করে রাখার প্রথা ছিল।

৮. কোমা ইনু

ভাষান্তর- কোরিয়ার এক প্রাচীন সাম্রাজ্যের (গোরেও) কুকুর।

অন্যান্য নাম- শিশি (মুখ হা করা কোমা ইনুদের নাম)।

আবাস- মন্দির, মঠ আর পবিত্র স্থানে।

খাদ্য- মাংসাশী।

চেহারা-

কোমা ইনু-রা হল পবিত্র প্রাণী যাদের প্রধান কাজ ছিল পবিত্র স্থানের সুরক্ষা করা। এদের আকৃতি একটি ছোট কুকুর থেকে একটা বড় সিংহের মত হতে পারে। এদের চেহারার সাথে কুকুর এবং সিংহ, দুটি প্রাণীরই সাদৃশ্য থাকার কারণে এদের সিংহ-কুকুরও বলা হয়ে থাকে। এদের ঘাড়ে থাকে মোটা কেশর এবং এদের দেহ হয় পেশীবহুল। কিছু কিছু কোমা ইনু-র মাথায় থাকে একটা বাঁকানো শিং।

স্বভাব-

কোমা ইনু-রা ভয়ঙ্কর হলেও পবিত্র প্রাণী। এদের কাজ হল মন্দির বা মঠের মত পবিত্র স্থানে দ্বার পাহারা দেওয়া। এরা সব সময় জোড়ায় থাকে- একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী। এদের মধ্যে স্ত্রী ইনু-রা বাড়ির মধ্যে বসবাসকারীদের রক্ষা করে আর পুরুষ ইনু-রা রক্ষা করে বাড়িটিকে।

মানুষের মুখোমুখি-

কোমা ইনু-রা জাপানের পবিত্র স্থানের প্রতীক। যে কোন শিন্টো মঠের দরজার

সামনে দেখতে পাওয়া যায় এক জোড়া কোমা ইনু-র মূর্তি। এই জোড়ার মধ্যে একজনের মুখ থাকে হাঁ করা আর অন্য জনের মুখ থাকে বন্ধ। এই প্রাণী দুটি ইন আর ইয়াং-এর (জীবন আর মৃত্যু) প্রতীকও বটে। মুখ হাঁ করা ইনু-কে বলা হয় 'আ' শব্দের প্রতীকী আর মুখ বন্ধ করা ইনু হল 'আং' শব্দের। এই দুটি শব্দ মিলিয়ে যে শব্দটি তৈরি হয় সেটা হল সংস্কৃত শব্দ 'ওম'-এর জাপানী সংস্করণ।

৯. নোজুছি

ভাষান্তর- বন্য মুগুর।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- মাঠ, ক্ষেত।

খাদ্য- মাংসাশী, তবে সাধারণত এরা ইঁদুর, খরগোশ, পাখি জাতীয় প্রাণী খায়।

চেহারা-

নোজুছি হল জাপানী উপকথায় পাওয়া প্রাচীন কিছু প্রাণীর মধ্যে একটি। এরা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয় আর এদের চেহারাও হয় অদ্ভুত। ছোট, মোটা মুগুরের মত দেখতে প্রাণীটি লম্বায় প্রায় পনেরো সেন্টিমিটার মত হয়। আবার কিছু কিছু নোজুছি হয় প্রায় এক মিটার লম্বা। এদের মুখে চোখ, নাক কিছুই থাকে না। শুধু থাকে একটা বড় মুখ গহ্বর। এই মুখ গহ্বরটা থাকে একদম মাথার উপরে। এদের দেহটা শুঁয়োপোকার মত ঘন রোঁয়া দিয়ে ঢাকা থাকে।

নোজুছিরা ইচ্ছে মত মানব রূপও ধরতে সক্ষম, তবে সাধারণত এদের মানব রূপে দেখা যায় না। এরা মানব রূপ ধরলে সেই রূপও হয় ভয়ানক। এরা সাধারণত রূপ ধরে একজন সাধুর, তবে সেই সাধুর চোখ, নাক বা কান থাকে না। এই সাধুর বহ্মতালুর কাছে থাকে একটা বড় মুখ গহ্বর। বলা হয় দুষ্ট সাধু, যাদের মন্দির থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, তারা জঙ্গলে গিয়ে পরিণত হয় নোজুছিতে।

স্বভাব-

নোজুছিরা পাহাড়ের উপরের বড় গাছে তাদের বাসা করে। এরা খুব দ্রুত চলাচল

করতে পারে না। তাই পাহাড় থেকে নামার সময়, এরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যায়। এরা বন্য ইঁদুর, খরগোশ, কাঠবেড়ালি ইত্যাদি ছোট ছোট প্রাণীদের ভক্ষণ করে। তবে কিছু কাহিনী অনুযায়ী, এরা একটা গোটা হরিণকে একগ্রাসে খেয়ে ফেলতে সক্ষম।

মানুষের মুখোমুখি-

নোজুছিরা মানুষকে তখনই আক্রমণ করে যখন সেই মানুষ এদের বাসার কাছে পৌঁছে যায়। এরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে এসে সেই মানুষটির পা জড়িয়ে ফেলে এদের লম্বা সর্পিল দেহ দিয়ে। এদের কামড়ও বেশ বিষাক্ত। এরা কাউকে কামড়ে দিলে সেই কামড়ের জায়গায় দগদগে ঘা হয়ে যায়। তারপর প্রচণ্ড জ্বরে ভুগে মৃত্যু হয় সেই প্রাণী বা মানুষের। কিছু কিছু কাহিনীতে বলা হয় যে কোন মানুষ যদি নোজুছিকে দেখেও ফেলে, তাহলেও সে প্রবল জ্বরে মারা যায়।

১০. ওনিবি

ভাষান্তর- আগ্নি রাক্ষস।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- জঙ্গল, পাহাড়, কবরস্থান।

খাদ্য- জীবন শক্তি।

চেহারা-

বলা হয় ওনিবিরা মানুষ বা পশুদের মৃতদেহ থেকে জন্ম নেয়। এরা হল এক ধরণের ভয়ঙ্কর প্রেত। এদের দেখতে হয় ছোট ছোট আগুনের গোলার মত যার রং হয় নীল। কোন কোন কাহিনীতে এদের রং লাল বা হলুদও হতে পারে। এরা সব সময় কুড়ি তিরিশ জনের দলে ঘোরাফেরা করে। এই গোলোকের ব্যাস তিরিশ সেন্টিমিটার মত হয় আর এরা মানুষের চোখের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। এরা বছরের সব সময় দর্শন দিলেও, বর্ষাকালে এদের গতিবিধি বেড়ে যায়।

স্বভাব-

ওনিবির কাহিনী পাওয়া যায় সমগ্র জাপান জুড়ে। কোন কোন স্থানে এই অগ্নি গোলকের মুখও থাকে, তারা কথাও বলতে পারে। এই ওনিবির কথা যারা শুনতে পায়, ওনিবি তাদের জীবন শক্তি ভক্ষণ করে।

মানুষের মুখোমুখি-

ওনিবিরা অগ্নি গোলোক হলেও এদের দেহে তাপ খুব একটা থাকে না। তবে

ৰ্িবিত কোন প্রাণীর কাছাকাছি এলেই এরা সেই প্রাণীর জীবন শক্তি শুষে নেয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রানীটা মারা যায়। রাতের বেলায় ওনিবিদের দেখে অনেকেই লন্ঠন বলে ভুল করে আর এদের ফাঁদে গিয়ে পা দেয়।

১১. হিতোদামা

ভাষান্তর- মানব আত্মা।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- কবরস্থান।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

হিতোদামা হল মানুষের দৃশ্যমান বিদেহি আত্মা যা মৃত্যুর পর তার দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এদের কোন আকার থাকে না। এরা লাল, কমলা বা নীল অগ্নি গোলক হয়ে মাটির খুব কাছে ভেসে বেড়ায়।

স্বভাব-

গ্রীষ্ম কালের রাতে, কবরস্থানে পাশে দেখা যায় হিতোদামাদের। কখনও কখনও আবার সদ্য মৃত ব্যক্তির বাড়ির পাশেও এদের দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে এসে হাজির হয় হিতোদামা। তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সাথে নিয়ে এরা আবার ভেসে ভেসে চলে যায়। সাধারণত এদের রাতে দেখা গেলেও কিছু ক্ষেত্রে এদের সকাল বেলাতেও দেখা গেছে। কিছু উপকথায় বলা হয় যে মানুষ অজ্ঞান হলেও তার দেহ থেকে তার আত্মা বেরিয়ে হিতোদামা হয়ে ভেসে বেড়ায়, আবার সেই মানুষটির জ্ঞান ফিরে এলে আত্মা তার দেহে প্রবেশ করে।

মানুষের মুখোমুখি-

হিতোদামারা সাধারণত ক্ষতিকারক হয় না। তবে এদের সাথে যদি কেউ ওনিবিকে চটিয়ে ফেলে, তাহলে কিন্তু বাঁচার আসা খুবই কম। অন্যান্য অগ্নি গোলোক প্রেতের থেকে এদের আলাদা করার উপায় হল, হিতোদামাদের একটা ল্যাজ থাকে, তাই ল্যাজ বৈশিষ্ট অগ্নি গোলোক হল হিতোদামা।

১২. কোদামা

ভাষান্তর- গেছো আত্মা।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- গভীর জঙ্গল।

খাদ্য- নেই; এরা যে গাছে বসবাস করে, সেই গাছের সাথেই জড়িত থাকে এদের জীবন শক্তি।

চেহারা ও স্বভাব-

কোদামা হল পাহাড়ি গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী গাছেদের আত্মা। এরা গাছেদের দেহ থেকে বেরিয়ে ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলের মধ্যে। এরা জঙ্গলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখাতে সাহায্য করে। কোদামাদের সচরাচর দেখা যায় না। তবে এদের ডাক শোনা যায় অনেক দূর থেকেও। এদের ডাক সারা জঙ্গলে অনেকটা সময় ধরে প্রতিধ্বনিত হয়। যদিও বা কখনও এরা দৃশ্যমান হয়, তখন এদের দেখতে লাগে একটা মরা আলোর গোলকের মত। আবার কোন কোন সময় এদের আকার হয় মানব দেহের মত, তবে আবছা সাদা রঙের। এই কোদামাদের জীবন শক্তি সরাসরিভাবে জড়িত থাকে তাদের দেহ অর্থাৎ গাছের সাথে। দুজনের একজনও মারা গেলে গাছ আর কোদামা দুজনেই মারা যায়।

মানুষের মুখোমুখি-

স্থানীয় জাপানী মানুষদের কাছে কোদামারা হল গাছের দেবতা আর জঙ্গলের রক্ষাকর্তা। এরা এদের জঙ্গলের আশে পাশের জমিকে জীবনশক্তি দিয়ে আশীর্বাদ করে।

হয় সেই কারণেই গ্রাম্য মানুষেরা কোন কোদামার বাসস্থান বৃক্ষ চিনতে পারলে, সেই বৃক্ষের কান্ডে 'শিমেনায়া' নামক একটি দড়ি বেঁধে দেয়। বলা হয়, কোদামার বসস্থান বৃক্ষটি কাটলে সেখান দিয়ে রক্ত বের হয়। এই ধরণের গাছ কাটলে সেই কাঠুরের উপর বর্ষিত হয় কোদামার অভিশাপ, যার ফলে সেই মানুষটির জীবন ছারখার হয়ে যায়।

১৩. ইয়ামাবিকো

ভাষান্তর- প্রতিধ্বনি।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ি অঞ্চলে, কর্পূর গাছের ভিতরে।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

জাপানের জঙ্গলে একাধিক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোন কোন প্রতিধ্বনি সাধারণ প্রতিধ্বনির থেকে অনেকটা আস্তে শোনা যায়, আবার কোনটা আসল শব্দের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়। এই ধরণের প্রতিধ্বনি জঙ্গল থেকে এলে, সেটা হয় কোদামার ডাক। আর এই একই ধরণের প্রতিধ্বনি যদি পাহাড়ি এলাকা থেকে আসে, তাহলে সেটার জন্য দায়ী হল ইয়ামাবিকো। এরা আকারে খুব ছোট হয় আর এদের দেহটা কুকুর আর বাঁদরের সংমিশ্রণে তৈরি হয়।

ইয়ামাবিকোদের চেনার একমাত্র উপায় হল এদের গলায় স্বর। এরা যে কোন শব্দকে অবিকল নকল করে ডাকতে পারে। মানুষের গলায় স্বর থেকে শুরু করে গাড়ি বা ট্রেনের আওয়াজও অবিকল নকল করার ক্ষমতা রাখে ইয়ামাবিকো। মাঝে মাঝে এরা জঙ্গল কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে ভয়ানক সব শব্দ করে। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি জঙ্গলের আশেপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে।

স্বভাব-

এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তার প্রধান কারণ হল এই প্রজাতির প্রেত খুবই বিরল। এরা জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের মধ্যে কর্পূর গাছে বসবাস করে। বহু যুগ ধরে এদের ডাককে কোন অজানা পাখির ডাক হিসেবে ধরে নিত স্থানীয় মানুষেরা। এডো সাম্রাজ্যের সময়কার পন্ডিত 'সাওয়াকি সুশি' আর 'তোরিয়ামা সেকিএন' প্রথম এদের চিত্র আঁকেন।

১৪. কিজিমুনা

ভাষান্তর- নেই।

অন্যান্য নাম- সেমা, বুনাগায়া।

আবাস- ওকিনাওয়া নামক গ্রামের বট গাছে।

খাদ্য- সামুদ্রিক প্রাণী, বিশেষ করে মাছের মাথা আর চোখ।

চেহারা-

জাপানের দক্ষিণের ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জের উপকথায় পাওয়া যায় একাধিক অদ্ভুত দর্শন প্রেতের কথা। এদের মধ্যে একটি হল এই কিলিমুনা। এরা অনেকটা বেঁটে মানুষের মত দেখতে যারা বিভিন্ন বট গাছে বসবাস করে। এরা লম্বায় একটি মানব শিশুর মত হয় তবে এদের মাথার চল হয় লাল আর গায়ের চামড়ার রঙও হয় লালচে। এদের পরনে থাকে ঘাসের তৈরি পোশাক আর এরা হাঁটার বদলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এদের বয়স বাড়লেও এদের দেহের গঠন থাকে মানব শিশুর মতই, তবে পুরুষ কিলিমিনাদের চেনা চায় এদের অত্যন্ত বড় অণ্ডকোষ দিয়ে।

স্বভাব-

কিলিমুনারা জীবন ধারনের সময় বিভিন্ন ভাবে মানুষের জীবনধারণকে নকল করে থাকে; যেমন এরা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে মৎস শিকার করে, বিবাহ করে, পরিবারের সাথে বসবাস করে। কোন কোন কাহিনীতে কিলিমুনাদের সাথে মানুষের বিবাহের কথাও পাওয়া যায়।

এদের প্রধান খাদ্য হল সামুদ্রিক মাছ। তবে এদের সব থেকে প্রিয় খাদ্য হল মাছের মাথা আর মাছের চোখ। বলা হয় মাছের ডান চোখের থেকে বাঁ চোখটাই এদের বেশি প্রিয়।

কিলিমুনাদের একাধিক অদ্ভুত ধরণের ভীতির কথা জানা যায়। এরা মুরগী আর রান্নার বাসনকে ভয় পায়। তবে এরা সব থেকে বেশি ঘৃণা করে অক্টোপাসদের। তাই যে কোন উপায়ে এরা সবসময় অক্টোপাসদের এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে।

মানুষের মুখোমুখি-

কিলিমুনারা মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে। এরা কিছু রান্না করা মাংসের বিনিময়ে জেলেদের মাছ ধরতে সাহায্য করে। এরা কোন মানুষের সাথে একবার বন্ধুত্ব করলে, সেই বন্ধুত্ব হয় আজীবনের জন্য। এরা মাঝে মাঝেই চলে আসে এদের সেই মানব বন্ধুর বাড়িতে।

মানুষ এদের আক্রমণ না করলে, কিলিমুনারা সাধারণত মানুষের আক্রমণ করে না। তবে কোন মানুষ যদি এদের বাসস্থান, বট গাছ কেটে ফেলে, তাহলে এদের রোষ গিয়ে পড়ে সেই মানুষটির উপর। এরা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষের ক্ষতি করতে থাকে। এরা প্রথমে মেরে ফেলতে থাকে গৃহপালিত প্রাণীদের, তারপর জেলেদের নৌকা পর্যন্ত মাঝ সমদ্রে ডুবিয়ে দেয়। এছাড়াও এরা মানুষকে বিভিন্ন ফাঁপা গাছের কান্ডের মধ্যে বন্দী করে রাখে। কোন কোন কাহিনীতে আবার বলা হয় যে এরা ঘুমন্ত মানুষের বুকের উপর বসে থাকে।

১৫. নুরে ওনাগো

ভাষান্তর- জলে শিক্ত নারী।

অন্যান্য নাম- নুরে হানাইওমে।

আবাস- বিভিন্ন জলাশয়ে।

খাদ্য- মনোযোগ।

চেহারা-

নুরে ওনাগোদের দেখতে হয় একটি অগোছালো যুবতীর মত; এদের মাথায় থাকে জট ধরা ভিজে চুল। এদের সারা শরীর জলে সিক্ত থাকে। বেশ কিছু উপকথা অনুযায়ী, এদের দেহ ঢাকা থাকে পচে যাওয়া পাতায়। এছাড়াও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ আটকে থাকে এদের সিক্ত শরীরে। এরা এদের ভিজে শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জলা জমির আশেপাশে। গ্রাম্য জাপানে এদের মাঝে মাঝে দেখা যায় নদী, হ্রদ বা প্রচণ্ড বর্ষণের রাতে।

মানুষের মুখোমুখি-

বলা হয় যেসব পুরুষ মারা যায়, তাদের বিধবা স্ত্রীদের মনে দুঃখ থেকে জন্ম হয় নুরে ওনাগোদের। এই কষ্টের অনুভূতিগুলি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং একটি নুর ওনাগোতে রূপান্তরিত হয়।

জাপানের শিকোকু আর ক্যুশু দ্বীপের মানুষরা মাঝে মাঝেই নদী বা সমদ্রের ধারে দেখতে পায় কিছু তরুণীকে যাদের দেহ একদম চপচপে ভিজে। সেই তরুণীরা পথে

ঘাটে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। বেশিরভাগ মানুষ এই রকম দৃশ্য দেখলে তারা সেই তরুণীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। যখন কোন মানুষ নুরে ওনাগোদের কাছাকাছি চলে আসে, তখন তারা সেই মানুষটির দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসে। যদি সেই মানুষটিও হাসে, তাহলে সেই নুরে ওনাগো সেই পরোপকারি মানুষটির সাথে সারা জীবনের জন্য বন্ধনে আটকে যায়। তবে এটা খুব একটা ভালো ব্যাপার নয়, কারণ নুরে ওনাগোদের দেহ থেকে সবসময় পচা জল ঝরে পড়ে আর সেই জল থেকে বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। যদিও এরা সরাসরি কোন মানুষের ক্ষতি করে না, তবে এদের উপস্থিতিই সেই মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। তাই নুরে ওনাগোদের সম্মুখীন হলে তাদের হাসির উত্তরে না হাসাই শ্রেয়। এই একটা উপায়েই এদের হাত থেকে বাঁচতে পারে মানুষ।

১৬. জোরোগুমো

ভাষান্তর- বেশ্যা মাকড়শা।

অন্যান্য নাম- নুরে হানাইওমে।

আবাস- শহর, গ্রাম, জঙ্গল, পাহাড়, গুহা সর্বত্র।

খাদ্য- পুরুষ।

চেহারা-

জাপানের উপকথায় এমন কিছু মাকড়শার কথা জানা যায়, যাদের থাকে বেশ কিছু ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এই ধরণের একটি প্রাণী হল জোরোগুমো। এরা হল জাপানের সর্বত্র বসবাসকারী একটি কুখ্যাত প্রেত। তবে উত্তর জাপানের হাক্কাইডো দ্বীপে এদের কাহিনী পাওয়া যায় না। সাধারণত এদের দেহ দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার লম্বা হলেও, এরা যে কোন সময় ইচ্ছেমত নিজের দেহের আকার বৃদ্ধি করতে সক্ষম। কিছু কিছু জোরোগুমো পাখি শিকার করে খায়। শুধু আকার নয়, এদের আরও একটি আকর্ষনীয় জিনিস হল এদের দেহের রং। এছাড়া, এরা খুবই শক্ত এবং সুন্দর জাল বুনতে পারে। সুন্দর দেখতে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটির সব থেকে প্রিয় খাদ্য হল মানব যুবক।

স্বভাব-

জোরোগুমোরা একাকী জীবন অতিবাহিত করতেই পছন্দ করে। এরা ইচ্ছেমত কখনও মাকড়শা আবার কখনও প্রেতের রূপ ধরে থাকে। যখন একটি মাকড়শায় বয়স চারশো বছর পার করে, তখন তার মধ্যে জন্ম নেই কিছু ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এই সময় তারা পোকা বা পাখি শিকার ছেড়ে শিকার করতে থাকে মানুষদের।

এরা এদের বাসা বানায় গভীর কোন গুহার মধ্যে, অথবা কোন পরিত্যক্ত বাড়িতে। এদের কাছে মানুষ আর পোকার মধ্যে কোন তফাত নেই। এছাড়া এরা ইচ্ছে মত যে অপরূপ সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরতে পারে।

মানুষের মুখোমুখি-

জোরোগুমোদের প্রিয় খাবার হল তরুন, সুদর্শন পুরুষ। যখন জোরোগুমো কোন সুদর্শন পুরুষকে দেখে, তখন সে নারীর রূপ ধরে নিয়ে তার সামনে হাজির হয়। তারপর নিজের রূপের মোহে ভুলিয়ে তাহকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে। একবার এদের বাড়িতে ঢুকলে, সেই পুরুষের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

জোরোগুমোদের জাল এতটাই শক্ত হয় যে সেই জাল ছিঁড়ে কোন মানুষই বেরিয়ে আসতে পারে না। এছাড়াও জোরোগুমোদের দেহে থাকে বিষ যেটা প্রয়োগ করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে পড়ে।

জোরোগুমোদের আরও একটা শক্তি থাকে, আর সেটা হল এরা অন্য মাকড়সাদের চালনা করতে পারে। এরা এতটাই শিকারে নিপুণ হয় যে একটি জোরোগুমো বছরের পর বছর মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে একই শহরে থেকে যেতে পারে। এদের বাড়ির নীচে জমে তাকে হাজার হাজার পুরুষের কঙ্কাল।

১৭. সুচিগুমো

ভাষান্তর- মাটির মাকড়শা।

অন্যান্য নাম- ওগুমো, ইয়াতসুকাহাগি।

আবাস- শহর, গ্রাম, জঙ্গল, পাহাড়, গুহা সর্বত্র।

খাদ্য- সব ধরনের প্রাণী, মানুষ।

চেহারা-

সুচিগুমোদের কথা পাওয়া যায় জাপানের সর্বত্র। সুচিগুমোরা অনেক দিক বাঁচে আর কয়েকশো বছর বাঁচার পর এরা প্রেতে পরিণত হয়। এদের দেহের আকার হয় বিরাট যার ফলে এরা শিকার হিসেবে মানুষকেও আক্রমণ করতে সক্ষম।

স্বভাব-

এরা সচরাচর জঙ্গল আর পাহাড়ে বসবাস করে। এরা এদের বাসা এমন করে সিল্ক দিয়ে বানায় যাতে খুব সহজেই শিকার সেখানে ফেঁসে যায়। অন্যান্য মাকড়শা প্রেতের মত, এরাও ছলের সাহায্য নেয় শিকার ধরার জন্য। জোরোগুমো যেমন নারী দেহের সাহায্য নেয় শিকার করার জন্য, সেরকম সুচিগুমোরা মানুষকে তার ইচ্ছেমতো জিনিস পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বশ করে।

উপকথায়-

বিখ্যাত উপকথার নায়ক 'মিনামোটো নো ইওরিমিতসু'-র সাথে একাধিক সুচিগুমোর যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়।

একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে একবার একটি সুচিগুমো চাকরের রূপ ধরে এসে ওষুধ বলে বিষ পান করাতে চায় মিনামোটোকে। যখন মিনামোটো দেখে যে তার দেহের আঘাত কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না, তখন সে বুঝতে পারে যে কোথাও একটা গন্ডগোল আছে। সে তখন সেই চাকরটির দিকে খোলা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে যায়। চাকরটির শরীরে তলোয়ারের আঘাত করতেই সে পালিয়ে যায় জঙ্গলে। এর ফলে সুচিগুমোর ইন্দ্রজাল ছিন্ন হয়। পরে সেই রক্তের দাগ দেখে মিনামোটো জঙ্গলে পৌঁছে দেখে একটা বিশালাকায় মাকড়শা জঙ্গলে মরে পড়ে আছে।

আর একটি কাহিনী অনুযায়ী, একটি সুচিগুমো একজন সুন্দরী যোদ্ধার রূপ ধরে একটি প্রেতের সেনা নিয়ে এগিয়ে আসে শহরের দিকে। মিনামোটো তার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে সেই প্রেত সেনার বিরুদ্ধে। মিনামোটো প্রথমেই আক্রমণ করে সেই সেনার সেনাপ্রধান সেই সুন্দরী নারীকে। সেই নারীকে প্রথম আঘাত করার সাথা সাথেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় বাকি প্রেত যোদ্ধারা। তখন সেই নারীকে তাড়া করে মিনামোট আর তার সৈন্যদল পৌঁছায় একটা গুহার সামনে। যেখানে গিয়ে তারা দেখে সেই নারীটি ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে একটি বিশাল মাকড়শায়। তলোয়ারের একটি আঘাতে মিনামোটো সেই মাকড়শার পেট চিরে দেয় আর সেই চেরা পেট থেকে বেরিয়ে আসে হাজার হাজার মানব শিশুর মত মাকড়শা। মিনামটো আর তার সৈন্যরা মিলা প্রতিটি মাকড়শা শিশুকে হত্যা করে।

১৮. আওসাজিবি

ভাষান্তর- নীল আগুনের সারস।

অন্যান্য নাম- গই নো হিকারি।

আবাস- নদী, জলাভূমি, এমন জায়গা যেখানে সারস জাতীয় পক্ষী দেখা যায়।

চেহারা-

জাপানী উপকথা অনুযায়ী, যখন পাখিরা অনেক বেশ বছর জীবিত থাকে, তখন একটা সময় পর তাদের মধ্যে জন্ম নেয় কিছু অস্বাভাবিক শক্তি। আওসাজিবি হল সেই রকমই একটি পাখি। এরা সাধারণত সারস পাখি থেকে আসে। সমগ্র জাপানে এদের কাহিনী ছড়িয়ে থাকলেও, এরা বসবাস করার জন্য গভীর জঙ্গলকেই বেছে নেয়। এদের বিশেষ করে রাতের বেলাতেই দেখা যায়।

স্বভাব-

অনেক বছর বাঁচার পর, কিছু সারসদের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। বুকের কাছে পালকগুলো একসাথে জুড়ে গিয়ে চকচকে আঁশ তৈরি হয়। তখন এদের নিঃশ্বাসের সাথে এদের ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসে এক ধরণের হলদে রঙের পদার্থ, যা ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। বসন্ত কালের রাতের বেলা, এদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয় একটা নীলচে আভা। তখন এদের ঠোঁট থেকে নির্গত সেই হলদে পদার্থ হয়ে যায় উজ্জ্বল নীল রঙের আগ্নি শিখা। সেই অগ্নি শিখা আওসাজিবিরা ছড়িয়ে দেয় আকাশে। তবে এই অগ্নিতে কোন উত্তাপ থাকে না আর অন্য কিছুতে অগ্নি সংযোগ করার ক্ষমতাও থাকে না। ধীরে ধীরে সেই নীলচে অগ্নি বাতাসে মিলিয়ে যায়।

মানুষের মুখোমুখি-

বেশিরভাগ বন্য পক্ষীর মত আওসাজিবি-রাও সচরাচর মানুষের সামনে আসে না। যখন এরা সাধারণ পক্ষী থেকে প্রেত পক্ষীতে পরিবর্তিত হয়, তখনও এরা মানুষের অগোচরেই থাকতে পছন্দ করে। তবে জঙ্গলের মধ্যে শিকারীরা মাঝে মাঝে বসন্তের রাতে দেখতে পায় আওসাজিবিরা দল বেঁধে মুখ থেকে নীল আগুন নির্গত করছে। এরা মানুষের কোন ক্ষতি সাধন করে না।

১৯. ইতাছি

ভাষান্তর- বেজি।

অন্যান্য নাম- তেন।

আবাস- সমগ্র জাপানের পাহাড়ি এলাকায়।

খাদ্য- মাংসাশী।

চেহারা-

জাপানী উপকথা অনুযায়ী, পাখি, মাকড়শার মত আরও বেশ কিছু প্রাণী বহুকাল বেঁচে থাকলে তারা ধীরে ধীরে প্রেতে পরিণত হয়। জাপানীদের মতে বেজি একটি অপয়া প্রাণী। এরা মানুষের জীবনে বয়ে আনে দুঃসময়। এই ইতাছিরা অন্যান্য প্রেতের মতই ইচ্ছেমত যে কোন রূপ ধরতে সক্ষম। এছাড়াও এদের থাকে বেশ কিছু ইন্দ্রজালিক শক্তি।

মানুষের মুখোমুখি-

ইতাছিরা দুষ্ট আর ছলনাময় প্রকৃতির হলেও এরা সচরাচর মানুষের সামনে আসতে চায় না। শুধু দর্শন নয়, ইতাছিদের ডাককেও জাপানিরা অশুভ লক্ষণ হিসেবে দেখে। তাদের বিশ্বাস যে যদি কোন মানুষ ইতাছিদের ডাক শুনতে পায়, তাহলে তার জীবনে নেমে আসে কষ্টের ছায়া। ইতাছিরা নিজেদের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে বিভিন্ন রকম বিপদে ফেলে। বলা হয়, যখন কোন ইতাছি তার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তারা কোন মানুষকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করে। তবে সম্মোহন করে সেই মানুষটির কোন ক্ষতি তারা করে না, এই সম্মোহন করে তারা সেই মানুষটিকে

দিয়ে নিজেদের কিছু কাজ করিয়ে নেয়। এরা যখন দলে থাকে, তখন এরা আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। এরা একে অপরের মাথার উপর উঠে একটা উঁচু স্তম্ভ তৈরি করে। তারপর সেই স্তম্ভে জ্বলে ওঠে আগুন। এই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে জঙ্গল। মাঝে মাঝে এরা শহরে ঢুকে এই স্তম্ভ বানালে পুরো শহরটাও পুড়ে যেতে পারে।

ইতাছিরা যখন নিজেদের আকার পরিবর্তন করে, তখন তারা রূপ নেয় একটা শিশু সাধকের। এদের দেখে চেনার উপায় হল এই শিশু সাধক যে পোশাক পরে থাকে, সেটা তাদের দেহের তুলনায় অনেক বড়। এই রূপ ধরে ইতাছিরা প্রধানত মদ বা নেশার দ্রব্য খুঁজে বেড়ায়। এছাড়া ইতাছিরা মাঝে মাঝে অন্যান্য প্রেতের রূপ ধরে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য।

২০. কামা ইতাছি

ভাষান্তর- কাস্তের মত বাঁকা দেহ বিশিষ্ট বেজি।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- যে কোন জায়গায়।

খাদ্য- মাংসাশী।

চেহারা-

জাপানের ইয়ামানাসি, নানাগো আর নিগাতা অঞ্চলে বসবাস করে কামা ইতাছি নামক এক ধরণের দ্বন্দ্বপ্রিয় ইতাছি। এই এলাকার মানুষরা এই কামা ইতাছিদের বেশ সমীহ করে চলে। এই অদ্ভুত প্রানীগুলো বাতাসে বা ঝড়ে উড়ে চলাচল করতে সক্ষম। এদের হাতে আর পায়ে থাকে লম্বা, ধারালো ইস্পাতের মত কঠিন নখ। এদের দেহ ঢাকা থাকে লোমে, তবে এই লোমগুলো হয় শজারুর কাঁটার মত। এরা কুকুরের মত ডাক ছাড়ে। এরা এত তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে, যে সাধারণ মানুষের চোখে এরা প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকে।

মানুষের মুখোমুখি-

কামা ইতাছিরা তিনজন একত্র হয় মানুষকে আক্রমণ করে। প্রথমে একটি কামা ইতাছি শিকারের পা কেটে তাকে ভূপতিত করে। তখন দ্বিতীয় জন তার হাত-পায়ের নখ দিয়ে শিকারের দেহে একাধিক বার আঘাত করে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখন তৃতীয় জন সেই শিকারের উপর একটা ঐন্দ্রজালিক তরল ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে তার দেহের বেশিরভাগ কাঁটা জায়গা মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে যায়। এই তরলের ফলে

শিকারটির মৃত্যু হয় না।

কামা ইতাছিরা এতটা হিংস্র ভাবে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে তাদের এক একটা আঘাতে মানুষটার দেহের মাংস পর্যন্ত কেটে পড়ে যায়। তবে সেই আঘাত এতটাই তীক্ষ্ণ যে সেই ক্ষত স্থান থেকে মাংস কেটে নেওয়ার সময় এক ফোটা রক্তও মাটিতে পড়ে না। এই আক্রমণ এতটাই তাড়াতাড়ি হয়, যে মানুষটির জ্ঞান ফিরলে সে বুঝে উঠতে পারে না তার দেহে এত ক্ষত কথা থেকে এল।



ইয়ামাওয়ারো

২২. ইয়ামাওয়ারো

ভাষান্তর- পাহাড়ি শিশু।

অন্যান্য নাম- ইয়ামাওরাওয়া।

আবাস- পাহাড়, বিশেষ করে ক্যুশু দ্বীপপুঞ্জ আর পশ্চিম জাপানে।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

ইয়ামাওয়ারো হল একধরণের পার্বত্য দেবতা। এদের সাথে কাপ্পা আর গারাপ্পাদের সম্পর্ক খুবই নিকট। এদের দেহটা অনেকটা দশ বছরের মানব শিশুর মত হয় আর এদের মাথায় থাকে লম্বা ধূসর কেশ। এছাড়াও এদের সারা শরীর ঢাকা থাকে হাল্কা লোমে। এদের ছোট্ট দেহের তুলনায় এদের পা-গুলো হয় অনেক লম্বা। তবে এদের দেহের সব থেকে অদ্ভুত জিনিস হল এদের একটা মাত্র চোখ। আর সেই চোখটা থাকে কপালের একদম মাঝখানে, আড়াআড়ি ভাবে। এরা হরবোলাদের মত সব কিছুর আওয়াজ নকল করতে সক্ষম। এমনকি এরা ইচ্ছে মত মানুষের ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে পারে।

মানুষের মুখোমুখি-

এরা গরু বা ঘোড়া দেখলেই তাদের উপর আক্রমণ করে আর তাদের মেরে ফেলে। খেলার মধ্যে, এদের প্রিয় খেলা হল সুমো। হ্যোসুবের মত এরাও রাতের বেলায় মানুষের বাড়িতে ঢুকে বাথটবে স্নান করতে ভালোবাসে।

ইয়ামাওয়ারোদের প্রধানত দেখা যায় পাহাড়ে। আর কোন কাঠুরে এদের পাহাড়ি

রাস্তায় দেখে ফেললে এরা সেই কাঠুরের সাহায্যও করে। তবে এই কাজের বিনিময়ে তাদের দিতে হয় খাবার। খাবার পেলে এরা পরে আবার এসে সেই মানুষের কাজে সাহায্য করে যায়।

তবে এই ইয়ামাওয়ারোদের খাবার দেওয়ার সময় বেশ কিছু সতর্কতা মেনে চলতে হয়। খাবারের পরিমাণ যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে এরা খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। আর এদের কাজের আগে যদি খাবার দেওয়া হয়, তাহলে এরা খাবার খেয়ে কাজ না করেই পালিয়ে যায়।

এই ইয়ামাওয়ারোদের ব্যাপারে কুমামোটো নামক পুঁথি থেকে আরও একটা অদ্ভুত জিনিস জানা যায়। এখানে বলা হয়েছে যে ইয়ামাওয়ারো আর গারাপ্পা আসলে একই প্রেতের দুটো ভিন্ন নাম। এরা শীতকালে পাহাড়ে বসবাস করে ইয়ামাওয়ারো হয়ে আর গরমের সময় এরা নদীতে থাকে গারাপ্পা হয়ে।

প্রতিবছর বসন্তের সময় সব গারাপ্পারা পরিবর্তিত হয় ইয়ামাওয়ারোতে। আর তখন তারা নদী থেকে উঠে চলে যায় পাহাড়ি এলাকায়। আবার শরৎ কালে এরা গারাপ্পায় পরিবর্তিত হয় ফিরে আসে নদীতে। তবে এই পরিবর্তনটাও বেশ ভয়ানক। এদের চলাচলের পথে কোন মানুষের বাড়ি থাকলে এরা সেটা গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। আর কোন মানুষ যদি এদের পরিবর্তনটা দেখে ফেলে তাহলে সে ভয়ানক জ্বরে মারা যায়।

২৩. আজুকি আরাই

ভাষান্তর- সজিম ধাবক।

অন্যান্য নাম- আজুকি টোগি।

আবাস- গভীর জঙ্গলে।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

আজুকি আরাই হল এক ধরণের অদ্ভুত প্রেত যাদের কাহিনী পাওয়া যায় সমগ্র জাপানের পাহাড়ি এলাকা জুড়ে। এদের একাধিক স্থানীয় নাম আছে আর সেই নামের মধ্যে সব থেকে প্রচলিত নাম হল আজুকি টোগি। এরা বসবাস করে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আর দিনের প্রায় বেশিরভাগ সময় এরা অতিবাহিত করে কোন ঝর্ণার পাশে। এদের খুব একটা দেখা যায় না। তবে এদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে বলা হয়েছে যে এদের দেহটা ছোট আর এদের চোখগুলো হয় অত্যাধিক বড় আর গোলাকার। এদের দেখলে মনে হয় কোন বৌদ্ধ সাধক। এদের মুখে সর্বত্র লেগে থাকে একটা মলীন হাসি আর এদের লম্বা লম্বা হাতে থাকে মাত্র তিনটি করে আঙুল।

স্বভাব-

আজুকি আরাইদের বিশেষ দেখা যায় না, তবে এদের ব্যাপারে একাধিক কাহিনী প্রচলিত। এদের প্রধান কাজ হল লাল রঙের আজুকি শিম ধুয়ে রাখা। এরা নদী বা ঝর্ণার ধারে বসে সেই শিম ধোয় আর ভয়নক গান গায়। সেই গানের মানে হল, ''আমি কি নিজের মনে লাল শিম ধোব, নাকি মানুষ ধরব আর খাব?''

মানুষের মুখোমুখি-

পথে যেতে যেতে যদি কোন মানুষ আজুকি আরাইদের গান শুনে ফেলে, তাহলে সে নদীতে পড়ে যায়। এই জলে পড়ার শব্দে আজুকি আরাইদেররা চমকে ওঠে আর সেই স্থান থেকে পলায়ন করে। মানুষের সাথে আজুকি আরাইদের সাক্ষাৎ শুধুই শব্দের মাধ্যমে। এরা মানুষের সামনে কোন ভাবেই আসে না। আর মানুষ যাতে এদের দেখতে না পায় তার জন্য সব সময় লুকিয়ে বেড়ায়। বিভিন্ন পশুর গলা নকল করতে পারে বলে লুকিয়ে থাকার সময় এরা সেই সব শব্দ ব্যবহার করে। যেহেতু এদের সচরাচর দেখা যায় না, তাই আজুকি আরাইদের দর্শনকে জাপানে সৌভাগ্য হিসেবে দেখা হয়।

২৪. আজুকি হাকারি

ভাষান্তর- শিমের বিপরীত।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- গ্রামে, বাড়িতে, চিলেকোঠায়।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

এই আজুকি হাকারি হল এক ধরণের উপদ্রবকারী প্রেত যাদের পাওয়া যায় বিভিন্ন বাড়িতে আর মন্দিরে। এদের দেখা যায় না, এদের চেনা যায় শুধু এদের শব্দ থেকে। এরা সাধারণত চিলেকোঠায় অথবা বাগানে ঘোরাঘুরি করে, আর সব থেকে বেশি কার্যকরী হয় রাতের অন্ধকারে। এদের কেউ কোনদিন চাক্ষুষ দেখেনি। তবে এদের শব্দ অনেকেই শুনেছে।

স্বভাব-

আজুকি হাকারি বাড়ির মধ্যে দৃশ্যত হয় রাতে বেলায়, সাধারণত মধ্য রাতের পর। এদের আগমন হলে সেটা প্রথমে জানা যায় চিলেকোঠা আর ছাদ থেকে আসে পায়ের শব্দ থেকে। এর পরেই পাওয়া যায় একটা ছন্দবদ্ধ শব্দ। অনেকটা মাটিতে গুলি জাতীয় কোন জিনিস ছড়িয়ে দিলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমন। তবে সেই শব্দটা ছাদ থেকে আসে না, আসে জানলা বা দরজার বাইরে থেকে। এই শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। তারপর শুরু হয় জল ছেটানোর শব্দ। আর সব শেষে শোনা যায় ঘরের দরজার বাইরে কাঠের খড়ম পরা পায়ের শব্দ। তবে সেই সময়ে কেউ যদি দরজা বা জানলা খুলে দেয়, তাহলে শব্দটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

২৫. আজুকি বাবা

ভাষান্তর- শিম বুড়ো।

অন্যান্য নাম- আজুকি টোগা বাবা।

আবাস- জঙ্গলে, মাঝে মাঝে উত্তর জানাপের গ্রামে।

খাদ্য- মানুষ।

চেহারা-

জাপানের মিয়াগি প্রদেশের উপকথায় পাওয়া যায় একটি ভয়ঙ্কর প্রেতের কাহিনী। তার নাম আজুকি বাবা। অন্যান্য আজুকি প্রেতের মত এরা শুধু ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না। এদের দেখতে হয় একটি কুৎসিত দর্শন বৃদ্ধার মত। এদের পরনে থাকে শতছিদ্র সাদা রঙের পোশাক। আর এরা প্রায় সব সময়ই হেঁড়ে গলায় কুৎসিত সব গান গাইতে থাকে। এরা প্রধানত দৃশ্যত হয় বর্ষা অথবা কুয়াশাছন্ন গোধূলিতে।

স্বভাব-

প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের কথা অনুযায়ী, কুয়াশাছন্ন রাতে দেখা যায় একটা উজ্জ্বল সাদা আলো। সেই আলো থেকে ভেসে আসে কুৎসিত স্বরে গাওয়া গান। এটা দেখার পর যারা পালিয়ে যেতে পারে না, তারা শিকার হয় এই ভয়ঙ্কর প্রেত আজুকি বাবার।

২৬. ওয়া ন্যুডো

ভাষান্তর- চাকা সাধু

অন্যান্য নাম- নেই

আবাস- নরক, তবে রাস্তায় বা পাহাড়ে এদের দেখা মেলে

খাদ্য- আত্মা, শিশু

চেহারা-

ওয়া ন্যুডোদের দেখতে হয় বেশ অদ্ভুত। এদের দেহটা হয় একটা বড় জ্বলন্ত গরুর গাড়ির চাকার মত, আর সেই চাকার মাঝখানে থাকে কেশহীন মাথা।

বৌদ্ধ মতে যে সব মানুষ তাদের জীবনকালে অত্যাধিক অপরাধ করে, মৃত্যুর পর নরকে তাদের জন্য স্থির হয় কঠোরতম শাস্তি। তাদের আজীবন নরকে পরিচারকের কাজ করতে হয়। এদের অপরাধের জন্য প্রথমে এদের মাথার চুল কেটে দেওয়া হয় আর তারপর তাদের মস্তক ছেদন করে প্রতিস্থাপিত করা হয় একটি জ্বলন্ত চাকার মাঝখানে। এই শাস্তিকে বলা হয় কাতাশারিন। কোন পুরুষ এই শাস্তি পেলে তাদের নাম হয় ওয়া ন্যুডো আর কোন স্ত্রীলোক এই শাস্তি পেলে তাদের বলা হয় কাতাওয়াগুরুমা। এরা চাকার মত ঘুরতে ঘুরতে চলে বেড়ায় নরক আর পৃথিবীর মাঝের রাস্তায়। আর সেখানে কোন আত্মা দেখতে পেলে এরা তাদের নরকে টেনে নিয়ে যায়।

স্বভাব-

এরা নরকের পরিচাচক হলেও এদের বেশিরভাগ সময় কাটে পৃথিবীতে। এরা

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খুঁজে বেড়ায় দুষ্ট মানুষের আত্মা। এরা নিজেরা যেহেতু জ্বলন্ত চাকার আগুনে সবসময় পুড়তে থাকে, তাই এরা অন্য মানুষের উপর অত্যাচার করেও বিশেষ আনন্দ পায়। এরা সাধারণত দুষ্ট অপরাধী অথবা দুষ্ট পুজারীকে ধরে নরকে নিয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে এরা কোন কোন সাধারণ মানুকেও নিয়ে যায় নরকে, বিচার করার জন্য। এই ভাবে ওয়া ন্যুডোদের কাজ করে যেতে হয় যতদিন না এদের পূর্ব জন্মের পাপের সাজা শেষ হয়।

মানুষের মুখোমুখি-

যখন কোন মানুষ এই ওয়া ন্যুডোদের দেখতে পায়, তখন সে যদি রাস্তার উপর থেকে অথবা দরজার সামনে থেকে সরে যায়, তাহলে এরা বেঁচে যেতে পারে। ওয়া ন্যুডো তাদেরই আক্রমণ করে যাদের এরা চোখে দেখতে পায়। বাড়ির বাইরে মন্ত্রপূত মালা বা দেবতার পুজোর সামগ্রি রাখলেও ওয়া ন্যুডোরা সেই বাড়ির কাছে আসে না। তবে এই ওয়া ন্যুডো একবার কোন মানুষকে দেখে ফেললে, তারা তার আত্মাকে তার শরীর থেকে আলাদা করে পড়ি দেয় নরকের উদ্দেশ্যে।

উপকথায়-

এই ওয়া ন্যুডো সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত কাহিনী পাওয়া যায় ক্যোতো প্রদেশের উপকথায়। একবার একটি ওয়া ন্যুডো গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তখন একজন গৃহবধূ কৌতূহলবশত লুকিয়ে লুকিয়ে সেই দৃশ্য দেখে ফেলে। ওয়া ন্যুডো বুঝে যায় আর সেই গৃহবধূর উদ্দেশ্যে বলে, ''তুমি আমাকে কি দেখছো, যাও নিজের সন্তানকে দেখো।''

সেই গৃহবধূ ভীত হয় তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে দেখে সেই শিশুটি মাটিতে শুয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। শিশুটির চারিদিকে ছিড়িয়ে আছে রক্ত আর শিশুটির পা দুটো নেই। আতঙ্কিত হয়ে সে ওয়া ন্যুডোর দিকে তাকালে সে লক্ষ্য করে ওয়া ন্যুডর মুখ থেকে ঝুলছে শিশুটির রক্তাক্ত দুটো পা।

২৭. কাতাওয়াগুরুমা

ভাষান্তর- বক্র চাকা।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- নরক, তবে রাস্তায় বা পাহাড়ে এদের দেখা মেলে।

খাদ্য- আত্মা।

চেহারা-

এদের দেখতেও হয় ওনেক্টা ওয়া ন্যুডোর মত। এখানে এদের দেখতে আরও ভয়ানক। এদের দেখতে হয় একটা অত্যাচারিত নগ্ন নারীর মত যে একটা জ্বলন্ত চাকার চড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই জ্বলন্ত চাকার উপর বসে থাকার ফলে তাদের দেহ ধীরে ধীরে পুড়ে যেতে থাকে।

স্বভাব-

কাতাওয়াগুরুমার স্বভাবটাও অনেকটা ওয়া ন্যুডোর মতই। এরাও সারা জাপান জুড়ে আস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে জনবসতির মধ্যে থেমে নরকের জন্য আত্মা শিকার করে।

মানুষের মুখোমুখি-

যে মানুষ এদের দেখে ফেলে, তাদের এরা ভয়নক সব অভিশাপে অভিশাপ্ত করে। এই অভিশাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে। আর তারপর একে একে মারা পড়তে থাকে মানুষ। এই ধ্বংসলীলা ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না সেই শহরটি মানুব শূন্য

না হয়ে যায়।

উপকথায়-

১৬০০ শতাব্দীর একটি কাহিনী অনুযায়ী, একবার এক কাতাওয়াগুরুমা আক্রমণ করেছিল একটি গ্রামকে। বলা হয়, সেই গ্রামটির অবস্থান ছিল বর্তমানের শিগা শহরে। কাতাওয়াগুরুমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল একজন গৃহবধূ। সেটা বুঝতে পেরে তার শিশুকে অপহরণ করে কাতাওয়াগুরুরমা। নিজের সন্তানের শোকে সেই গৃহবধূ কাতাওয়াগুরুমার কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি কবিতা রচনা করে আর সেটা গ্রামের মাঝখানে একটা খুঁটিতে টাঙিয়ে দিয়ে আসে। পরের দিন রাতে যখন কাতাওয়াগুরুমা দেখে যে সেই গৃহবধূ সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী, তখন সে তার শিশুকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেয় সেই গৃহবধূকে।

২৮. ওনি

ভাষান্তর- রাক্ষস।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- নরক, পরিত্যক্ত জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়।

খাদ্য- সর্বভুক, বিশেষ করে গবাদি পশু, মানুষ আর মদ।

চেহারা-

এই ওনি হল জাপানী উপকথার একটি বিরাট চরিত্র। এদের দেহ হয় বিরাট আর দেখতেও হয় ভয়ঙ্কর। এদের উচ্চতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এরা হয় জঙ্গলের সব চেয়ে উঁচু গাছের থেকেও লম্বা। একটি বর্ণনা অনুযায়ী এদের দেহের চামড়া হয় লাল বা নীল রঙের, মাথায় একটা বা দুটো শিং থাকে। এছাড়াও থাকে লম্বা দুটিও শ্বাপদ দন্ত। অন্যান্য বর্ণনায় এদের দেহের রং, শিং আর চোখের সংখ্যা হয় ভিন্ন। এদের পরনে থালে পশুর চামড়ার তৈরি পোশাক। এই ওনিরা প্রচণ্ড বলশালী হয়, আবার এদের মধ্যে কিছু ওনির থাকে ঐন্দ্রজালিক শক্তি।

স্বভাব-

বলা হয়, দুষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর পরিবর্তিত হয় ওনিতে আর এই ওনিরা গিয়ে উপস্থিত হয় বৌদ্ধ নরকের একটি স্তরে। ওনি হিসেবে এরা হিংস্র আর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এরা তখন নরকের রাজা এন্মার পরিচারকের কাজ করে। এরা মানুষের আত্মাকে মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারে, আর এই কাজে এরা প্রচণ্ড আনন্দ পায়। এই ওনিদের একটি প্রধান কাজ হল নরকে শাস্তি দেওয়া। এই শাস্তিগুলোও ভয়ানক, যেমন দেহ থেকে

চামড়া ছিঁড়ে নেওয়া, হাড় ভেঙে গুঁড়ো করে দেওয়া ইত্যাদি।

বলা হয়, যখন কোন মানুষ তার জীবৎকালে এত পাপ করে যে মৃত্যুর পরেও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব হয়ে যায়, তখন সেই মানুষগুলো পরিবর্তিত হয় ওনিতে। যতদিন এই ওনি পৃথিবীতে থাকে, ততদিন তারা বিভিন্ন ভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে।

২৯. কিজো

ভাষান্তর- রাক্ষসী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- নরক, পরিত্যক্ত জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়।

খাদ্য- সর্বভুক, বিশেষ করে গবাদি পশু, মানুষ আর মদ।

চেহারা-

কিজো হল ওনিদের স্ত্রী লিঙ্গ। এদের দেহটা নারীর হলেও এদের রূপ হয় বীভৎস। এদের চোখ হয় হলুদ বা লাল, নীলচে চামড়া, ছুঁচালো শিং আর লম্বা নখ হল কিজোদের দৈহিক বিশিষ্ট। এছাড়াও এদের থাকে বেশ কিছু ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এদের পরনে থাকে শতছিন্ন পোশাক আর মাথার চুল থাকে অবিন্যস্ত।

স্বভাব-

কিজো হল সেই সব নারী যারা মানুষ থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে ভয়ানক রাক্ষসীতে। এই পরিবর্তনের কারণ হয় ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা অথবা দুষ্ট কর্ম। একবার কিজোয় পরিবর্তিত হয়ে গেলে, সেই নারীরা লোকালয় ছেড়ে চলে যায় পরিত্যক্ত কোন স্থানে। এরা সাধারণত বসবাস করে দুর্গম পাহাড়ী গুহায়, পরিত্যক্ত বাড়িতে। এদের সেই বাড়ি হয় পাহাড়ি কোন পথের ধারে, যেখানে তারা মাঝে মাঝেই মানুষ শিকার করতে পারে। এই কিজোরা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, তবে এদের শক্তি ওনিদের তুলনায় অনেক কম। আবার ওনিদের থেকে এদের ঐন্দ্রজালিক শক্তি হয় অনেক বেশি। এরা ইচ্ছে মত মানুষকে অভিশপ্ত করতে সক্ষম।

মানুষের মুখোমুখি-

ওনিদের মত জাপানী উপকথায় একটা বিরাট জায়গা জুড়ে আছে কিজোদের কাহিনী। বলা হয় যে সকল নারী জীবিত কালে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত থাকে, তারাও পরিবর্তিত হয় কিজোতে। আর যে সকল পুরুষ এই সব দুষ্ট নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাদের মৃত্যু হয় কিজোর হাতেই।

৩০. রেইকি

ভাষান্তর- রাক্ষসের আত্মা।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- এদের দেহের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

কোন কোন ওনি মারা যায় প্রাকৃতিক নিয়মে আর কাউকে মরতে হয় কোন মানুষের হাতে। তবে মারা যাওয়ার পরেও এরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। এদের মধ্যে কারুর প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ থাকে আবার কেউ মারা যাওয়ার সময় এতটাই যন্ত্রণা পায় যে সেই মুহূর্তে এদের আত্মা দেহ ছাড়া হয়ে যায়, তবে মুক্তি পায় না। তারা তখন মানব জগতেই থেকে যায় রাক্ষস, প্রেত হিসেবে। এদের বলা হয় রেইকি। জীবিত থাকার সময় এদের যেরকম দেখতে ছিল, মৃত্যুর পরেও সেরকমই দেখতে থাকে, শুধু মৃত্যুর পর রেইকি হয়ে গেলে এদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয় একটা হাল্কা আভা। তাছাড়া এদের কোন পূর্ণ অবয়ব হয় না, এরা একটা আধা-স্বচ্ছ রূপে বিরাজ করে।

স্বভাব-

রেইকিদের একটি মাত্র কর্ম থাকে, আর সেটা হল প্রতিশোধ। এরা সেই সব মানুষের উপর আক্রমণ করে যারা এর মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরক্ষ ভাবে দায়ী। এরা এদের শিকারের সাথে নিজেদের জড়িয়ে রাখে অথবা নিজেদের মৃতদেহের আসে পাশেই বসবাস করে। আর কোন মানুষ যদি সেই স্থানে আসে, তাহলে এরা সেই

মানুষকে আক্রমণ করে। এরা পৃথিবীর বুকে ততদিন বসবাস করতে পারে যতদিন না কোন বৌদ্ধ সাধক এদের মুক্তি দিচ্ছে।

উপকথায়-

জাপানী উপকথায় রেইকিদের কাহিনী খুবই কম পাওয়া যায়। সেই কাহিনীগুলির মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত কাহিনীটি গাংজি নামক একটি মন্দির নিয়ে। নারা প্রদেশের গাংজি মন্দিরের ঘণ্টা ঘরে একবার বসবাস শুরু করেছিল একটি ভয়ঙ্কর রেইকি। যার ফলে এই ঘণ্টা ঘরে প্রায় রোজই পাওয়া যেতে থাকে একটি করে শিশুর মৃতদেহ। এই রেইকির শক্তি এতটাই ছিল যে কোন সাধকই তাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে ঈশ্বরের সন্তান হারকিউলিস এসে সেই রেইকিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নারা প্রদেশের শিশুদের রক্ষা করে।

৩১. জুবোক্কো

ভাষান্তর- বৃক্ষ শিশু।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- যুদ্ধক্ষেত্র।

খাদ্য- রক্ত।

চেহারা-

যুদ্ধক্ষেত্র অথবা এমন কোন স্থান যেখানে একসাথে একাধিক মানুষের প্রাণ নেওয়া হয়েছে, সেই সব স্থানের মাটি সেই মৃত মানুষদের রক্তে সম্পৃক্ত থাকে। সেই মাটিতে দেখা যায় এক ধরণের অদ্ভুত গাছ। এই গাছগুলিকে বলা হয় জুবোক্কো। দূর থেকে দেখে জুবোক্কোদের আলাদা করে চেনার কোন উপায় নেই। এদের দেখতে হয় সেই স্থানে বেড়ে ওঠা অন্যান্য গাছের মতই। তবে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই গাছের ডালের অদ্ভুত আকৃতি অথবা এদের কান্ডের পাশে ছড়িয়ে থাকে বেশ কিছু মানুষের হাড়। উপকথা অনুযায়ী, একসময় এরাও সাধারণ বৃক্ষই ছিল, তবে মাটি থেকে মানুষের রক্ত শোষণ করে এরা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে প্রেত বৃক্ষে। আর সেই কারণেই এদের একমাত্র খাদ্য হল মানুষের রক্ত।

স্বভাব-

জুবোক্কো অপেক্ষা করে এমন কোন মানুষের, যে চিনতে না পেরে এই সব প্রেত বৃক্ষের নীচ দিয়ে চলাচল করে। এরা এদের নীচে এলেই জুবোক্কোরা তাদের লম্বা বক্র ডালের সাহায্যে জড়িয়ে ধরে সেই মানুষটিকে। সেই ডাল তখন সেই মানুষের চামড়ার

মধ্যে প্রবেশ করে মানুষটির দেহের রক্ত শুষে নিতে থাকে। দেহের সব রক্ত শেষ হয়ে গেলে জুবোক্কোরা দেহটিকে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন সেই মৃতদেহের মাংস খেতে আসে বিভিন্ন পশু। অবশেষে পড়ে থাকে শুধু হাড়।

৩২. সুরুবে ওতোশি

ভাষান্তর- কুয়োর পড়ন্ত বালতি।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- জঙ্গল

খাদ্য- মাংসাশী, প্রধানত মানুষের ক্ষতবিক্ষত শরীর।

চেহারা-

সুরুবে ওতোশি হল কোন মানুষ, ওনি বা টেঙ্গুর বৃহৎ একটি মাথা। এদের কোন দেহ থাকে না। কোন কোন সময় এদের সেই মাথাকে ঘিরে থাকে অগ্নি। আবার কোন কোন সময় এদের দেখতে হয় একটা নাক মুখ বিশিষ্ট অগ্নি গোলকের মত। এরা এদের জীবনের বেশিরভাগটাই উঁচু গাছের ডালে বসে কাটিয়ে দেয়। তবে এদের বাসস্থান সেই গাছটি থাকে জঙ্গলের রাস্তার ধারে অথবা জনবসতির কাছেই। এই মুন্ডুসর্বস্ব প্রেতটির মাথার আকার হয় প্রায় দু মিটার লম্বা। যদিও কোন কোন কাহিনীতে এদের মাথার আকার হয় সাধারণ মানুষের মাথার মতই।

স্বভাব-

সুরুবে ওতোশিরা উঁচু গাছের ডালে নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করতে থাকে এমন কোন মানুষের যে সেই গাছের তলা দিয়ে যাবে। এদের ক্ষিদে পেলে এরা পাথরের মত গাছের উপর থেকে মাটিতে পড়ে যায়। গাছ থেকে পড়ে এদের কাজ হয় কোন পশুকে বন্দী করে খেয়ে ফেলা। যদি এই সুরুবে ওতোশিরা বৃহৎ আকারের হয়, তাহলে এরা কোন মানুষের উপর পড়ে তাদের পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে এরা

আবার সেই গাছের উপরে উঠে যায়। এরা এদের চাপে মানুষ বা পশু মারতে খুবই উপভোগ করে। তাই খিদে না পেলেও মাঝে মাঝে এরা নীচে পড়ে মানুষ মারতেও পছন্দ করে। এরা অনেক উপর থেকে এদের শিকারের উপর পড়ে যার ফলে সেই শিকারের দেহ এদের দেহের দ্বারা চূর্ণ হয়ে যায়। এরা নিজেরা না পড়ে, মাঝে মাঝে বড় পাথরও ফেলতে থাকে এদের শিকারের উপর।

৩৩. গাশাডোকুরো

ভাষান্তর- প্রাণবন্ত নরকরোটি।

অন্যান্য নাম- ওডোকুরো।

আবাস- যুদ্ধক্ষেত্রে, গোরস্থান।

খাদ্য- মানুষ খেতে এরা খুবই পছন্দ করে।

চেহারা-

গাশাডোকুরো হল এক ধরণের বৃহৎ আকার কঙ্কাল যারা গভীর রাতে ঘুরে বেড়ায় গ্রাম্য জাপানে। চলা ফেরার সময় এদের দেহের হাড়ে হাড়ে ধাক্কা লেগে একটা 'গাছি গাছি' শব্দ হয়। তবে এই শব্দটি খুবই ক্ষীণ। রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানোর সময় এরা যদি কোন মানুষকে দেখতে পায়, তাহলে এরা সন্তর্পণে তাদের পিছনে এসে দাঁড়ায়। তারপর নিজেদের বিরাট হাতের সাহায্যে সেই মানুষটিকে চেপে ধরে আর দাঁত দিয়ে তার মাথা ছিঁড়ে নেয়।

উপকথায়-

বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়া সৈনিক অথবা দুর্ভিক্ষপিড়ীত হয়ে মারা যাওয়া মানুষ, যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তাদের দেহ ধীরে ধীরে পচে যায় আর পড়ে থাকে সেই স্থানেই। এদের আত্মা দেহ ছেড়ে অন্য জগতে যেতে অক্ষম হয়। তখন এরা পুনর্জন্ম নেয় প্রেত হিসেবে আর সে ভাবেই থেকে যায় চিরকাল। যে সব মানুষ মনে ক্রোধ বা ব্যাথা নিয়ে মারা যায়, তাদের সেই ক্রোধ বা ব্যাথা তাদের দেহের মাংস পচে গেলেও বেঁচে থাকে হাড়ের মধ্যে। এই ক্রোধ ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে জন্ম দেয় বিভিন্ন

ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এই ধরনের হাজারটা মৃতদেহের হাড় একত্রিত হলে সেই হাড় থেকে জন্ম নেয় গাশাডোকুরো।

এই গাশাডোকুরোরা এতটাই শক্তিশালী হয় যে এদের বধ করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এরা পৃথিবীর বুকে ততদিন ঘুরে বেড়ায়, যতদিন এদের দেহ থেকে এদের সব শক্তি ক্ষয় না হয়ে যায়। যেহেতু একটি গাশাডোকুরোর জন্মের জন্য এক হাজারটা মৃতদেহ লাগে, তাই গাশাডোকুরো নামক প্রেতটি খুবই বিরল।

এই গাশাডোকুরোদের কাহিনী প্রথম পাওয়া যায় প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে। সেই সময় 'তাইরা নো মাসাকাডো' নামক এক সামুরাই, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তবে রাজার সাথে যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। এই তাইরা-রা কন্যা, তাকিয়াসা ছিল একজন বিখ্যাত জাদুকর। সেই যুদ্ধে মারা যাওয়া হাজার সৈনিকের দেহ থেকে কালো যাদুর দ্বারা জন্ম দেয় একটি বিরাট কঙ্কালকে। আর সেই কঙ্কালকে বলা হয় ক্যোতো শহরে আক্রমণ করতে।



ইয়ামাউবা

৩৪. ইয়ামাউবা

ভাষান্তর- পাহড়ি বুড়ি

অন্যান্য নাম- ওনিবাবা, ইয়ামানবা

আবাস- পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘর বা পাহাড়ি গুহা

খাদ্য- সর্বভুক

চেহারা-

ইয়ামউবা হল জাপানী উপকথায় ডাইনি বুড়ি। এরা সাধারণত পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে থাকে। এরা এক সময় মানুষ ছিল তবে ধীরে ধীরে কলুষিত হতে হতে পরিবর্তিত হয়েছে ইয়ামউবায়। এদের কারুর মাথায় আছে শিং, আবার কারুর আছে শ্বাপদ দন্ত। তবে এই সব বিশিষ্ট ছাড়া এদের দেখতে হয় সাধারণ মানব বৃদ্ধার মত।

মানুষের মুখোমুখি-

এরা পথের ধারে জীর্ণ কুটিরে সাধারণত একাকী বসবাস করতেই ভালোবাসে। এই কুটিরে এরা মাঝে মাঝে পথচারীদের বিশ্রাম নিতে দেয়। তারপর গভীর রাতে যখন সেই পথচারী গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন ইয়ামউবারা নিজেদের আসল রূপ ধরে। তারপর তারা এদের ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে সেই পথচারীটিকে সম্মোহিত করে তাদের জ্যান্ত খেয়ে ফেলে। তবে মাঝে মাঝে কোন কোন পথচারী এদের হাত থেকে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছে।

উপকথায়-

বলা হয় আগেকার দিনে যদি কোন নারী তার জীবদ্দশায় কোন গর্হিত কাজ করত, তাহলে তাকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করে পাঠিয়ে দেওয়া হত জঙ্গলে। জঙ্গলে থাকতে থাকতে এরা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হত ডাইনীতে।

আবার অন্য কিছু কাহিনী অনুযায়ী, এই ইয়ামউবাদের জন্ম হয় খরা আর দুর্ভিক্ষের সময়। দুর্ভিক্ষের সময় যখন পরিবারের লোকেরা খেতে পেত না, তখন তারা নিত একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। তারা পরিবারের একজনকে রেখে আসত জঙ্গলের মধ্যে, যাতে তার ভাগের খাওয়াটা বাকিরা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বেশিভাগ সময়, পরিবারের সব থেকে বয়স্ক মানুষকে রেখে আসা হত। বলা হয়, এই প্রথার জন্য যে সব বৃদ্ধাকে জঙ্গলে রেখে আসা হত, তাদের অন্তরের রাগ থেকেই তারা পরিবর্তিত হত ভয়ঙ্কর ডাইনি ইয়ামউবাতে।

৩৫. কোতেঙ্গু

ভাষান্তর- দৈবিক সারমেয়।

অন্যান্য নাম- কারাসু তেঙ্গু।

আবাস- পাহাড়, গুহা, জঙ্গল।

খাদ্য- গবাদি পশু, বন্য জন্তু, মানুষ।

চেহারা-

কোতেঙ্গুদের দেখতে হয় একটি বৃহৎ পক্ষীর মত যাদের বেশ কিছু দৈহিক বিশিষ্ট মানুষের মতও হয়। এদের পরনে থাকে এক ধরনের লম্বা পোশাক যেগুলোকে বলা হয় ইয়ামাবুশি। আগেকার দিনে এই ধরণের পোশাক সাধারণত জাদুকররা পরত। এদের কাছে বিভিন্ন রকম অস্ত্র থাকে যেগুলো এরা কোন মানুষের বাড়ি বা মন্দির থেকে চুরি করে।

স্বভাব-

কোতেঙ্গুরা হিংস্র দানবের মত হয়। এরা সাধারণত একাই বসবাস করে তবে মাঝে মাঝে এরা অন্যান্য কোতেঙ্গু বা অন্য ধরণের প্রেতের সাথে একত্রিত হয় কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য। এরা বিভিন্ন রকম ঐন্দ্রজালিক বস্তু চুরি করে জমিয়ে রাখে আর সময় মত সেগুলো বিক্রি পর্যন্ত করে। ক্রুদ্ধ হলে এরা শুরু করে ধ্বংসলীলা আর সেই ধ্বংসলীলার কারণে মানুষের বিশেষ ক্ষতি হয়।

মানুষের মুখোমুখি-

মানুষের প্রতি এদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা নেই। এরা মানুষের মাংস খেতে খুবই পছন্দ করে। এছাড়াও এরা মানুষের উপর বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করে, ইচ্ছে মত মানুষ খুনও করে থাকে। এদের আর একটি প্রিয় জিনিস হল মানব নারীদের ধর্ষণ করা। এছাড়াও এদের একটি প্রিয় খেলা হল মানুষের অপহরণ করে তাদের পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। এছাড়াও এরা বিভিন্ন সময়ে মানব শিশুদের অপহরণ করে তাদের একটা উঁচু গাছের মাথায় বেঁধে রাখে। সেখান থেকে এদের কান্না মানুষ শুনতে পেলেও তাদের কাছে পৌঁছানোর কোন উপায় থাকে না। এরা মানুষকে অপহরণ করে তাদের মল-মুত্র খেতে বাধ্য করে যতক্ষণ না সেই মানুষটি উন্মাদ হয়ে যায়। এরা সাধু আর সাধ্বীদের উপর বিশেষ করে আক্রমণ করে, মন্দির বা মঠ লুঠ করে। তাছাড়া এরা নতুন যুবতী সাধ্বীদের যৌন উত্তেজনার দ্বারা কুপথে চালিত করে।

এই কোতেঙ্গুদের প্রধান দুর্বলতা হল এদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। উপকথায় এই ধরণের একাধিক কাহিনী আছে যেখানে কোন মানুষ এই কোতেঙ্গুদের বোকা বানিয়ে এদের থাকে একাধিক মূল্যবান ঐন্দ্রজালিক বস্তু কিনে নিয়েছে। দাম হিসেবে কোতেঙ্গু পেয়েছে কিছু মূল্যহীন পাথর।

৩৬. দাইতেঙ্গু

ভাষান্তর- বড় তেঙ্গু।

অন্যান্য নাম- প্রত্যেকের আলাদা নাম আছে।

আবাস- উঁচু পর্বত চূড়া।

খাদ্য- কঠোর ধর্মীয় খাদ্যাভ্যাস।

চেহারা-

দাইতেঙ্গুরা সাধারণ কোতেঙ্গুদের থেকে বেশ খানিকটা বড় হয়। এরা সাধারণত মানুষের মতই দেখতে হয়; এদের পরনে থাকে একটা লম্বা পোশাক আর এদের দেখতে হয় একজন সৌম্যকান্তি সাধকের মত। এদের মুখটা হয় লাল রঙের আর এদের নাক হয় অত্যন্ত লম্বা। এছাড়াও এদের পিঠে থাকে দুটো ডানা।

স্বভাব-

দাইতেঙ্গুরা দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় একাকী বসবাস করতে ভালোবাসে। এরা ইচ্ছে করেই মানুষের জগৎ থেকে দূরে বসবাস করে। এরা এদের জীবনের বেশিরভাগ সময় সাধনা করেই কাটিয়ে দেয়। দাইতেঙ্গুদের শক্তি কোতেঙ্গুদের থেকে অনেকটাই বেশি থাকে। তবে বেশ কিছু কাহিনী অনুযায়ী এরা হয় খুবই হিংস্র। এই হিংস্রতা আর সেই সাথে প্রখর বুদ্ধি দাইতেঙ্গুদের অন্যান্য প্রেতের থেকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তোলে। কোন কোন সময় বলা হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যেও দায়ী এই দাইতেঙ্গুরা।

মানুষের মুখোমুখি-

দাইতেঙ্গুরা কোতেঙ্গুদের মত সুযোগ পেলেই মানুষ মারে না আর সেই জন্যেই এদের খুব একটা মনুষ্যত্বের শত্রু বলেও গণ্য করা হয় না। বরং এদের ভাবা হয় পাহাড়ের উপরে বসবাসকারী এক ধরণের দেবতা হিসাবে।

দাইতেঙ্গুদের সাথে শুগেন্দো পার্বত্য অঞ্চলের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। এই পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষেরা এই দাইতেঙ্গুদের দেবতা রূপে পুজো করে। এই সব এলাকা থেকে আস্তে আস্তে দাইতেঙ্গুদের কাহিনী ছড়িয়ে পরে সমগ্র জাপানে। কিছু কিছু কাহিনীতে বলা হয়েছে এই দাইতেঙ্গুরা মানুষের সাধনায় খুশি হয়ে মানুষকে বিভিন্ন গূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান দান করেছিল। উপকথায় কাহিনী অনুযায়ী, বিখ্যাত জাপানী যোদ্ধা মিনামোটো যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন দাইতেঙ্গুদের রাজা সোজোবোর কাছে।

৩৭. অন্যুডো

ভাষান্তর- বৃহৎ আকারের সাধু।

অন্যান্য নাম- স্থান বিশেষে ভিন্ন।

আবাস- পার্বত্য অঞ্চলে।

খাদ্য- গবাদি পশু আর মানুষ।

চেহারা-

অন্যডো হল জাপানি উপকথায় পাওয়া এক দম দানবের একত্রিত নাম। এদের যা বর্ণনা পাওয়া যায়, তা ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষের তুলনায় সামান্য লম্বা আবার কেউ কেউ পর্বত সমন উচ্চতার অধিকারী। কেউ যেমন মানুষের রক্ষাকর্তা তেমন কিছু অন্যুডো আবার মানুষখেকো।

স্বভাব-

অন্যুডোদের বিশেষ করে চারটে শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক- যারা মানুষের সাহায্য করে, দুই- যারা মানুষের অনিষ্ট করে, তিন- যারা অন্য কোন প্রেত থেকে পরিবর্তিত হয়ে অন্যুডো হয়েছে আর চার- যাদের স্বভাব উপরের কারুর সাথেই মেলে না।

অন্যুডোদের মধ্যে বেশিরভাগই পড়ে দ্বিতীয় শ্রেনীতে, মানে এরা সবাই মানুষের অনিষ্টকারী। এদের মধ্যে পড়ে হিতোসুমে ন্যুডো, মিকোশি ন্যুডো আর উমি বোজু। এরা মানুষের শত্রু আর ইচ্ছেমত এরা গ্রামে ঢুকে মানুষ মেরে খেয়ে ফেলে। সাথে ধ্বংস করে

দেয় সম্পূর্ণ গ্রামটা। মানুষের সাহায্যকারী অন্যুডোরা কিন্তু বিরাল। এরা মানুষকে বিভিন্ন জিনিস যেমন চাষ করা, চাকা বানানো শেখায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় ভারী বস্তু বয়ে নিয়ে মানুষের সাহায্য করে। তবে এরা মানুষের সাহায্য করলেও এরা কিন্তু মানুষের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে না। সামান্য মনোমালিন্য হলেই এরা হিংস্র অন্যুডোতে পরিবর্তিত হয়। তৃতীয় শ্রেনীর অন্যুডোরাই সংখ্যায় সব থেকে বেশি। তানুকি আর ইতাছির মত প্রেতরা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় অন্যুডোতে। এরা এদের বিরাট আর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে ভালোবাসে। তবে মাঝে মাঝে এরা মানুষ খুনই করে। চতুর্থ শ্রেনীর অন্যুডোরাই সব থেকে রহস্যময়। এদের স্বচক্ষে দেখা যাই না। শুধু পাওয়া যায় এদের পায়ের ছাপ।

৩৮. হিতোসুমে ন্যুডো

ভাষান্তর- এক চোখ বিশিষ্ট সাধক।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- বড় রাস্তায়।

খাদ্য- সর্বভুক, মাঝে মাঝে মানুষের মাংস।

চেহারা-

হিতোসুমে ন্যুডোদের লম্বা মানব পুরোহিত বলেই মনে হয়, কিন্তু মানুষের থেকে এদের একটা অত্যাধিক বিশিষ্ট আছে। আর সেটা হল এদের কপালের মাঝখানে থাকা একটা মাত্র চোখ। এদের পরনে থাকে দামী পোশাক আর এরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। এরা ঘুরে বেড়ায় দামী পাল্কিতে। তবে পাল্কির বেহারারা বুঝতেই পারে না যে তারা একটি প্রেতকে পাল্কিতে করে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এই বেহারারা বেশিরভাগ সময় হয় অন্য প্রেত বা মানব ক্রীতদাস। এই দামী পাল্কি দেখে পথচারীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তবে সেই পথচারীর সামনে যদি এই পাল্কি দাঁড়িয়ে যায় আর সেখান থেকে নেমে আসে হিতোসুমে ন্যুডো, তাহলে সেই পথচারীর দুর্দিন শুরু হয়ে যায়।

স্বভাব-

এই হিতোসুবে ন্যুডো হল অন্যুডোদের মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রজাতি। এরা এদের পাল্কি করে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর একেকি পথচারী দেখলেই তাদের আক্রমণ করে। অন্যান্য বেশ কিছু প্রেতের মত এরা ইচ্ছেমত এদের আকার বড় কিংবা

ছোট করতে সক্ষম। এরা জঙ্গলের সব থেকে বড় গাছটার থেকেও বেশি লম্বা হয়ে জঙ্গল তছনছ করে দেয়। যার ফলে জঙ্গলে কাজ করা মানুষ এদের পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়। এদের লম্বা লম্বা পা থাকার কারণে এরা মানুষের থেকে অনেক বেশি জোরে ছুটতে পারে। তার এদের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

উপকথায়-

ওয়াকাইয়ামা এলাকার একটি উপকথায় বর্ণিত আছে কিভাবে একজন পথচারীর পথে যাওয়ার সময় একটি বিরাট পাল্কি দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। সেই রকম পাল্কি সে জীবনে দেখেনি। তাই ভালো করে দেখার জন্য সে একটা গাছে উঠে পড়ে। সেখান থেকে সে দেখতে পায় যে সেই পাল্কি থেকে নেমে আসছে একটা বিরাট কুৎসিত দেখতে এক চোখ বিশিষ্ট দানব। মানুষটিকে দেখতে পেয়ে সেই দানবটা তাকে তাড়া করে সেই গাছের কাছে চলে আসে। কি করবে বুঝতে না পেরে মানুষটি দানবটিকে লক্ষ্য করে তার তলোয়ার চালিয়ে দেয়। আর মুহূর্তের মধ্যে পাল্কি সমেত দানবটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

ক্যোতো প্রদেশে দেখা যায় একটি হিতোসুবে ন্যুডোকে। বলা হয় এ নাকি বিখ্যাত সাধক ইনুকো-জি-র পুনর্জন্ম। এই ইনুকো-জি ছিলেন প্রচণ্ড অনুশাসন প্রিয় একজন সাধক। সামান্য ভুল করলেই সেই অন্যান্য সন্ন্যাসীদের তার মন্দির থেকে বহিষ্কৃত করতেন। ওনার মতে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে কলুষিত হচ্ছে বিভিন্ন সন্ন্যাসীর কুকর্মের জন্য। তাই মৃত্যুর পর উনি আবার জন্ম নেন হিতোসুবে ন্যুডো হয়ে, যাতে উনি ঘুষখোর আর কুকর্ম প্রিয় সন্ন্যাসীদের শাস্তি দিয়ে পারেন।

৩৯. মিকোশি ন্যুডো

ভাষান্তর- অপেক্ষারত সাধক।

অন্যান্য নাম- মিকোশি, মাইগে, তাকা বোজু।

আবাস- রাতের বেলায় রাস্তায়।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

মিকোশি ন্যুডো হল জাপানী উপকথায় এক ধরণের ভয়ঙ্কর প্রেত যারা রাতের অন্ধকারে একাকী পথচারীদের আক্রমণ করে। এদের দেখলে মনে হয় নিরীহ কোন সাধক বা পুরোহিত। তবে একাকী পথচারীর সামনে এলেই এরা ধীরে ধীরে ধরতে থাকে এদের আসল রূপ। তখন এদের দেহ নেয় বিরাট আকার আর সাথে এদের হাত থেকে বেরিয়ে আসে বড় বড় নখ। সারা দেহ ভরে যায় লোমে।

স্বভাব-

পথে চলাকালীন যদি কোন পথচারী চোখ তুলে মিকোশি ন্যুডো-র দিকে তাকায়, অমনি সে এরা নিজেদের আসল রূপ ধরে। বলা হয় যত দূর সেই পথচারীর চোখ যায়, এরা নাকি তত লম্বা হতে পারে। এর ফলে সেই পথচারী মাথা তুলে সেই দানবকে দেখতে গিয়ে নিজের দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পিছন দিকে পড়ে যায়। তখন মিকোশি ন্যুডো এসে সেই মানুষের ঘাড়ে কামড়ে দেয়।

মানুষের মুখোমুখি-

যে সব মানুষ এই ভয়ঙ্কর প্রেতের সামনে পড়ে, তারা মুহূর্তের মধ্যে মারা পড়ে মিকোশি ন্যূডো-র হাতে। যদিও এই সাক্ষাতের অনেকটাই নির্ভর করে সেই মানুষটির প্রতিক্রিয়ার উপর। যদি তারা মিকোশি ন্যূডোকে অবজ্ঞা করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তাহলে সেই দানব তাদের বাঁশের বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে মেরে ফেলে। যারা পিছন ঘুরে পালাতে চায়, মিকোশি ন্যূডো তাদেরও একই ভাবে মেরে ফেলে। যে সকল মানুষ মিকোশি ন্যূডো-দের দেখে ফেলে, তারাও মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে পাথর হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

এই দানবের হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে। আর সেটা হল যদি এদের চোখে চোখ রেখে ভয় না পেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে আর এদের মাথা থেকে পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়, তাহলে মিকোশি ন্যূডো নিজে ক্রুদ্ধ হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪০. তাকা ন্যুডো

ভাষান্তর- লম্বা পুরোহিত।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- শিখু আর কিঙ্কি প্রদেশের রাস্তায় আর পাহাড়ে।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

তাকা ন্যুডো হল মিকোশি ন্যুডো-র মতই একটি প্রেত। আঞ্চলিক নাম এবং চেহারায় মিল থাকার কারণে, তাকা ন্যুডো এবং মিকোশি ন্যুডো প্রায়ই একে অপরের সাথে গুলিয়ে গিয়েছে উপকথার কাহিনীতে। তাকা ন্যুডোরা সাধারণত গলির মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা একাকী পথচারীর সামনে হঠাৎ করে এসে হাজির হয় আর তাদের ভয় দেখায়। এদের বাকি দৈহিক বিশিষ্টগুলো মিকোশি ন্যুডোর মতই।

স্বভাব-

মিকোশি ন্যুডোকে যেভাবে পরাস্ত করা যায়, তাকা ন্যুডোদের পরাস্ত করার উপায়ও একই। অন্য কিছু কাহিনীতে বলা হয়েছে যদি কোন মানুষ স্কেল বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে এদের উচ্চতা মাপতে যায়, তাহলেও এরা ভয় পেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তাকা ন্যুডোরা অন্যান্য দানবের থেকে অনেকটাই কম হিংস্র। এরা শুধু এদের শিকারদের ভয় দেখিয়েই আনন্দ পায়। এরা এদের শিকারদের সাধারণত খুন করে না।

৪১. আবুরা সুমাশি

ভাষান্তর- তৈল পোষণকারী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- কুমামোটো প্রদেশের পাহাড়ের গুহায়।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

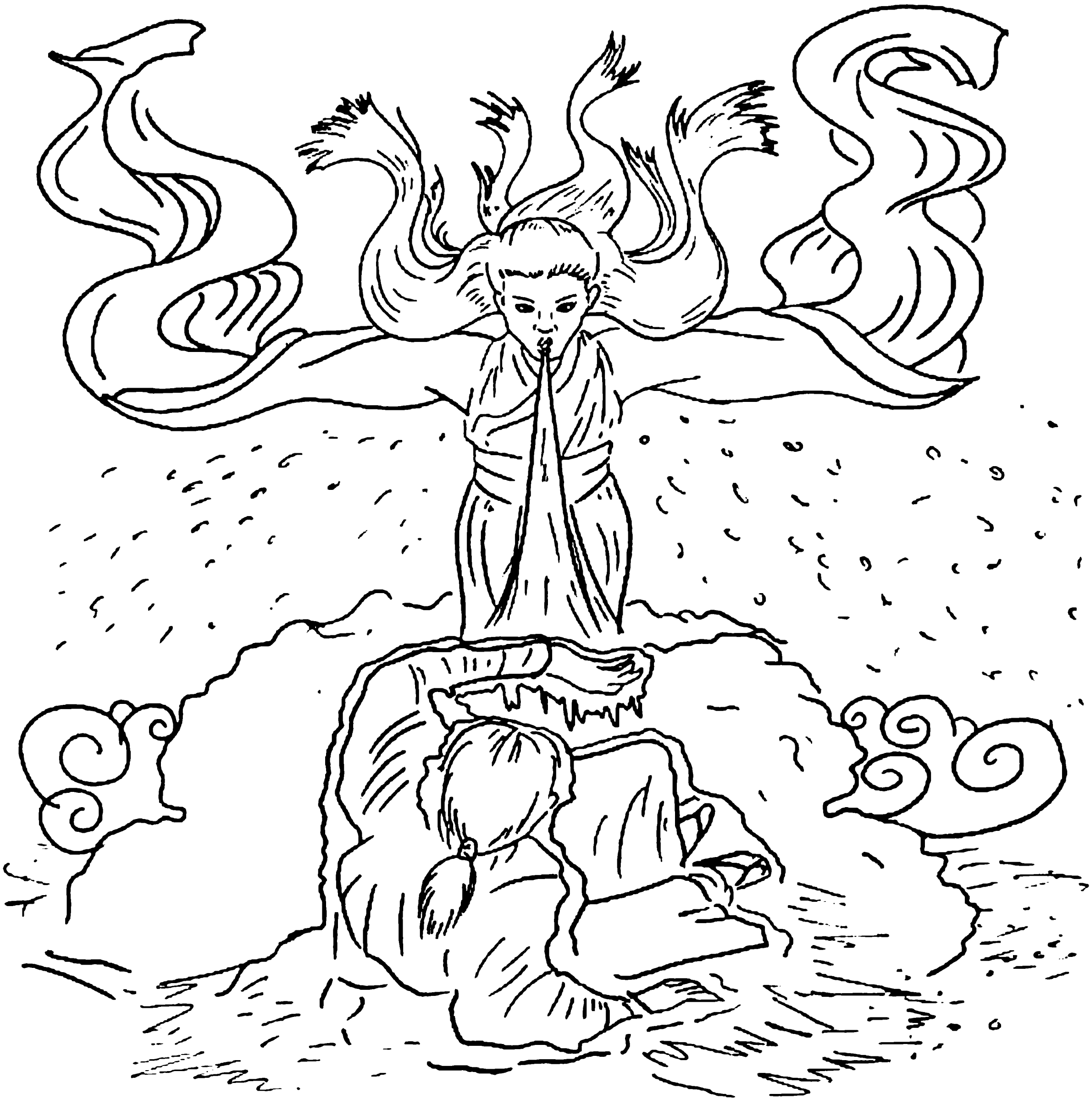
আবুরা সুমাশি হল কুমামোটো প্রদেশের একটি বিরল প্রেত। এদের দেখতে হয় একটি বেঁটে মানুষের মত আর এদের ছোট্ট শরীরের উপর বসানো থাকে একটা বৃহৎ কুৎসিত গোলাকার মুন্ডু। এদের পরনে থাকে পাতা দিয়ে তৈরি পোশাক। এই ধরণের প্রেত খুবই বিরল আর এদের পাওয়া যায় বিভিন্ন পাহাড়ী রাস্তায় আর গুহায়।

স্বভাব-

যেহেতু আবুরা সুমাশি একটি বিরল প্রজাতীর প্রেত, তাই এদের নিয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। উপকথা অনুযায়ী, সব থেকে বিখ্যাত আবুরা সুমাশিরা বসবাস করে কুসাজুনিগো গিরিপথে। আর মাঝে মাঝে এরা পথ চলতি মানুষের সামনেও চলে আসে। বিভিন্ন কাহিনীতে বলা হয়েছে যে এই পাহাড়ি গিরিপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন মানুষ যদি অপর মানুষকে বলে যে এই স্থানে বহুদিন আগে একটি আবুরা সুমাশি বসবাস করত, তাহলে তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের খাঁজ থেকে ভেসে আসে একটা গম্ভীর গলা। আর সেই গলায় উত্তর আসে, ''এখনও আছি।''

উপকথায়-

আবুরা সুমাশি কথাটার মানে হল তৈল পোষণকারী। এরা কুমামোটো পাহাড়ে জন্মানো চায়ের বীজ পিষে তেল বের করে। বলা হয় যে সব তেল চোর জঙ্গলে পালিয়ে আসত, তারা মারা যাওয়ার পর পরিবর্তিত হত আবুরা সুমাশি-তে।



উকি ওন্না

৪২. উকি ওন্না

ভাষান্তর- বরফ কন্যা।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- বরফে ঢাকা পাহাড়ের গিরিপথে।

খাদ্য- জীবন শক্তি।

চেহারা-

জাপানের পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী উনি ওন্না শিকার করে পাহাড়ের বরফের মধ্যে পথা হারানো পথচারীদের। এদের দেখতে হয় অপরূপ আর সেই রূপ আরও বাড়িয়ে দেয় এদের লম্বা কালো কেশ আর কালো চোখের তারা। এদের চামড়া হয় টানটান আর তার রং হয় ধবধবে সাদা। তবে এদের দেহের তাপমাত্রা হয় বরফের মত। এদের ছোঁয়া মাত্রই মানুষের দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। উনি ওন্নাদের খাদ্য হল মানুষের জীবন শক্তি। এরা মানুষের মুখ থেকে সেই জীবন শক্তি শুষে নিয়ে মানুষটিকে মেরে ফেলে।

মানুষের মুখোমুখি-

উনি ওন্নারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে মানুষ শিকার করে। এরা পাহাড়ের পথের ধারে লুকিয়ে অপেক্ষা করে আর সেই পথে যাতায়াত করা পথচারীদের আক্রমণ করে। কোন কোন সময় এরা সেই সব মানুষের বাড়িতেও পৌঁছে যায় এরা। সেখানে পৌঁছে এরা এদের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের দ্বারা বাড়ির সবাইকে বরফের মূর্তিতে পরিণত করে। যদিও এরা মানুষ শিকার করে, তবে বেশ কিছু কাহিনীতে মানুষের সাথে এদের প্রেমের

কথাও পাওয়া যায়। বেশ কিছু কাহিনী অনুযায়ী, এরা এদের শিকারের সাথে প্রেমে পড়ে তাদের মুক্তিও দিয়েছে। কোন কোন কাহিনীতে এরা বিবাহও করেছে মানুষদের। এরা সেই বিবাহের পরে বেশ কিছু বছর এরা সুখে থাকলেও অবশেষে এদের সত্যিটা জেনে যায় এদের স্বামীরা। আর সেখানেই এদের সুখী বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে যায়।

উপকথায়-

নিইগাতা প্রদেশের একটি উপকথায় বলা হয়েছে যে একজন বৃদ্ধ আর তার স্ত্রী মিলে পাহাড়ের গিরিপথে একটি খাবার দোকান চালাত। এক তুষারপাতের রাতে একজন তরুণী একাই এসে হাজির হয় সেই দোকানে। বেশ কিছুক্ষণ আগুনের পশে বসে শরীর গরম করার পর সেই তরুণী সেই বৃদ্ধের করা খাবার খেল। খাবার খাওয়ার সময় বাইরের তুষারপাত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল ভয়ানক তুষার ঝড়ে। কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যেই সেই তরুণী দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে সেই বৃদ্ধ তাকে দোকানেই থাকতে অনুরোধ করে। সে কথা না শুনলে বৃদ্ধ সেই তরুণীর হাত ধরে ভিতরে আনতে চাইলে মুহূর্তের মধ্যে তরুণীর ছোঁয়ার বৃদ্ধের জীবন শক্তি বেরিয়ে সে মারা পড়ে। তারপর সেই তরুণীর দেহ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় একটি ধোঁয়ার কুন্ডলিতে আর বাড়ির চিমনির মধ্যে দিয়ে সেই কুণ্ডলী বেরিয়ে যায় বাইরে।

আরও একটি কাহিনী পাওয়া যায় ইয়ামাগাতা প্রদেশের উপকথায়। একটি লোকের সাথে বিবাহ হয় একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণীর। তাদের বিবাহিত জীবন সুখেরই ছিল। তবে সেই লোকটার অভ্যাস ছিল রোজ রাতে গরম জলে স্নান করা। কিন্তু তার স্ত্রী কোনও দিনই সেই গরম জলের বাথটবে নামেনি। একদিন যখন বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল, তখন সেই লোকটা প্রায় জোর করেই তার স্ত্রীকে গরম জলের বাথটবে স্নান করতে বাধ্য করে। কিছুক্ষণ পর লোকটা লক্ষ্য করে যে সেই গরম জলের মধ্যে ভেসে আছে কিছু বরফের টুকরো; তার স্ত্রীর কোন চিহ্নই নেই। তখন সেই লোকটা বুঝতে পারে যে তার স্ত্রী আসলে ছিল একটি উনি ওন্না।

৪৩. শোজো

ভাষান্তর- নেই।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- সমুদ্রের ধারে, দ্বীপে, জলাভূমি।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

জাপানের সমুদের ধারে, বসবাস করে এক ধরণের জলজ প্রেত। এদের বলা হয় শোজো। এদের দেখতে হয় অনেকটা বাঁদরের মত, তবে এদের উচ্চতা হয় প্রায় মানুষের সমান। এছাড়াও এদের মাথায় থাকে অবিন্যস্ত লম্বা লাল কেশ। এদের মুখের রংটাও হয় লালচে। এরা মানুষের মত দুই পায়ে ভোর করে চলতে পারে আর মাঝে মাঝে পরনে থাকে ঘাসের তৈরি পোশাক।

স্বভাব-

শোজোরা এদের জীবন অতিবাহিত করে বালি নিয়ে খেলে আর মদ্যপান করে। এরা মদের নেশায় সমুদ্রের পাড়ে নাচ গান করে সময় কাটায়। এদের দেখতে বাঁদরের মত হলেও এদের বুদ্ধি কিন্তু প্রখর। এরা নিজেরা যেহেতু মদ্যপান করতে ভালোবাসে, তাই এরা নিজেরাও খুব উৎকৃষ্ট মানের মদ বানাতে সক্ষম। এরা কোন সৎ মানুষকে দেখলে সেই মানুষটিকে এদের বানানো মদ দান করে। তবে সেই মানুষ যদি অসৎ হয়, তাহলে শোজোদের বানানো সেই মদ তার কাছে হয়ে ওঠে বিষ। মুহূর্তের মধ্যে মারা যায় সেই অসৎ মানুষটি।

মানুষের মুখোমুখি-

শোজোরা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। আর মাঝে মাঝে দুয়েকটা কথাও বলতে পারে। এরা মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণই করে। এই শোজোরা সাধারণত একা থাকতেই ভালোবাসে আর এরা বসবাস করে মানুষের লোকালয় থেকে অনেকটাই দূরে। তবে কোন কোন কাহিনীতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন নাবিকের দলকে এই শোজোরা বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ করেছে, যখন এই নাবিকরা এদের জাহাজ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে শোজোদের বাসস্থানের কাছাকাছি। এরা খুব একটা হিংস্র হয় না। তবে এদের মানুষের পানীয়ের প্রতি খুব লোভ, তাই মাঝে মাঝে এরা সেই পানীয় চুরি করে আবার জলে পালিয়ে যায়।

৪৪. উশি ওনি

ভাষান্তর- মহিষ দানব।

অন্যান্য নাম-গ্যুকি।

আবাস- পশ্চিম জাপানের সমুদ্রের ধারে।

খাদ্য- মাংসাশী।

চেহারা-

পশ্চিম জাপানের উপকথায় পাওয়া যায় উশি ওনি নামক এক ভয়ঙ্কর প্রেত যারা বসবাস করে সমুদ্রের পাড়ে বা জলাভূমিতে। এদের দেখতে হয় অদ্ভুত; এদের মাথাটা হয় মহিষের আর দেহটা হয় দানবের। আবার অন্য কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এদের দেহটা হয় মহিষের আর মাথাটা হয় দানবের। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী এদের মাথাটা হয় মহিষের আর দেহ হয় মাকড়শা, বিড়াল অথবা কিমোনো পরিহিতা নারীর।

স্বভাব-

এদের দেখতে ভিন্ন হলেও প্রায় সব উপকথাতেই এদের চারিত্রিক বিশিষ্টগুলো একরকম। এরা প্রচণ্ড হিংস্র আর অত্যাচারী হয়। এদের নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসে বিষাক্ত বায়ু আর এদের প্রিয় খাবার হল মানুষ। এরা বিশেষ করে সেই সব মানুষকে আক্রমণ করে যারা অজান্তে এদের বাসস্থানের খুব কাছাকাছি চলে আসে। এছাড়াও এরা সাগরের পাড়ে লুকিয়ে থাকে শিকার ধরার জন্য। এছাড়াও এরা ইচ্ছেমত গ্রামে গ্রামে মহামারী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। শিখু এলাকার পাহাড়ি অঞ্চলে এদের কিছু কাহিনী পাওয়া গেলেও, এদের বেশিরভাগ কাহিনী পাওয়া যায় পশ্চিম জাপানের উপকুল ঘিরে।

কিছু কিছু উপকথা অনুযায়ী, এরা অন্যান্য প্রেতের সাথে দল বেঁধে মানুষকে আক্রমণ করে। পশ্চিম হনসু এলাকার মাকড়শাদেহী উশি ওনা দল বাঁধে বিশেষ করে নুরে ওনা আর ইসো ওনার সাথে। নুরে ওনা বা ইসো ওনা সুন্দর তরুণীর রূপ ধরে একাকী পুরুষকে নিয়ে আসে সাগরের পাড়ে। সাগরের খুব কাছে উশি ওনা লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তারপর মানুষটি কাছাকাছি এলেই সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলে। তারপর দুই প্রেত মিলে সেই মানুষের মাংস ভক্ষণ করে।

৪৫. নুরে ওন্না

ভাষান্তর- শিক্ত নারী।

অন্যান্য নাম-নুরে ইয়োমেজো।

আবাস- জলশয় বা নদীর কাছে।

খাদ্য- রক্ত।

চেহারা-

নুরে ওনা হল জাপানী উপকথার একটি সর্পদেবী প্রাণী যারা নদী বা সাগরে বসবাস করে আর মানুষ শিকার করে খায়। এদের সব থেকে বেশি দেখা যায় ক্যুশু দ্বীপের আশেপাশে। তবে এদের কাহিনী ছড়িয়ে আছে সমগ্র জাপান জুড়ে। এই নুরে ওন্না আবার দুই ধরণের হয়। এক শ্রেনীর নুরে ওন্নার হাত থাকে না। এদের দেহ হয় বিরাট একটা সর্পের মত আর মাথা হয় একজন যুবতীর। অপর শ্রেনীর নুরে ওন্নার দেহটা সর্পের আর মাথাটা নারীর হলেও এদের দেহের পাশ থেকে জন্ম নেয় দুটো মানুষের হাত। এদের মুখশ্রী হয় ভয়ঙ্কর আর সেই মুখে থাকে সর্পের মত চেরা একটা লম্বা জিভ। এদের মাথায় থাকে লম্বা কালো চুল।

স্বভাব-

যদিও এদের দৈহিক শক্তি মানুষের থেকে অনেকটাই বেশি, তবুও এরা মানুষ শিকার করার সময় আশ্রয় নেয় ছলের। এরা সচরাচর নদী বা সমুদ্রের পাড়ে অপেক্ষা করে। এরা ইচ্ছেমত রূপ ধরতে পারে বলে এরা মানুষ দেখলেই একজন পীড়িত নারীর রূপ ধরে। সেই নারীকে দেখতে হয় অপরূপ আর তার কোলে থাকে একটা শিশু। এরা

এমন ভাব করে যেন এরা জলে ডুবে যাচ্ছে আর মানুষটির কাছে সাহায্য চাইছে। যখন সেই মানুষটি কাছাকাছি চলে আসে, তখন নুরে ওন্না তাকে বলে তার শিশুকে আগে রক্ষা করতে। সেই শিশুটিকে মানুষটি হাতে নিলেই সেই শিশুটি পরিবর্তিত হয় একটি ভারি পাথরে। আর সেই পাথরের ওজনের ফলে মানুষটি নড়াচড়া করতে পারে না। তখন নুরে ওন্না সেই মানুষটিকে আক্রমণ করে। তারা তাদীর লম্বা জিহ্বার দ্বারা মানুষটির দেহ থেকে শুষে খায় রক্ত।

৪৬. ইসো ওন্না

ভাষান্তর- সাগর পাড়ের মানবী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- জলশয় বা নদীর কাছে।

খাদ্য- রক্ত।

চেহারা-

ইসো ওন্নাও নুরে ওন্নার মত জাপানের ক্যুশু দ্বীপের উপকথায় পাওয়া একটি রক্তখেকো প্রেত। এরা জেলে আর নাবিকদের আক্রমণ করে আর তাদের রক্ত খায়। নুরে ওন্নার মত এদের কোন সর্পিল দেহ বিশিষ্ট থাকে না। এরা পাথুরে সমুদ্র সৈকতে বসবাস করে আর শিকারের অপেক্ষা করে।

এই ইসো ওন্নাদের বর্ণনা ভিন্ন উপকথায় ভিন্ন। বেশিরভাগ কাহিনীতে এদের বর্ণনা করা হয় অপরূপ দেখতে নারীর মত। এদের দেহ থেকে সর্বত্র জল গড়িয়ে পড়তে থাকে, যেন এরা সবে মাত্র জল থেকে উঠে এল। এদের চুল হয় লম্বা আর অবিন্যস্ত। সেই চুল প্রায় ছুঁয়ে যায় মাটি। এদের চোখ হয় কলুষিত, যৌন আহ্লাদে ভরপুর। এদের পরনের স্বচ্ছ ভিজে পোশাকও এদের যৌন আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। কোমরের উপর থেকে এদের দেখতে হয় একজন নারীর মত তবে কোমরের নীচের অংশটা হয় কোন এক প্রায় স্বচ্ছ, যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কোন কোন উপকথায় এদের আকার এতটাই বড় হয় যে এরা এদের হাতের ধাক্কায় ডুবিয়ে দিতে পারে একটা গোটা জাহাজ। এছাড়াও এরা ইচ্ছে করলে একটা বড় পাথরের রূপ নিয়েও থাকতে পারে।

স্বভাব-

ইরা যখন সমুদ্রের সৈকতে বসে থাকে, তখন এদের দেখলে মনে হয় কোন সুন্দরী তরুণী অপার বিস্ময়ে সাগরের দিকে দেখছে। যখন কোন মানুষ এগিয়ে এসে এদের সাথে কথা বলতে যায়, তখন এরা পিছন ফিরে একটা বীভৎস শব্দে চিৎকার করে ওঠে। এই চিৎকারে সেই মানুষটি মুহূর্তের জন্য অনড় হয়ে যায়। তখন ইসো ওন্নারা এদের লম্বা চুল দিয়ে সেই মানুষটি গলা পেঁচিয়ে ধরে আর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যায়। তারপর তারা সেই মানুষটির রক্ত পান করে।

কোন কোন কাহিনী অনুযায়ী, এরা কোন পাথুরে সৈকতে বসে ভৌতিক আওয়াজে সেখান দিয়ে চলাচল করা মানুষদের ডাক দেয়। সেই ডাক যাদের কানে যায় তারা সম্মোহিতের মত সেই পাথুরে সৈকত থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এরা মারা গেলে ইসো ওন্নারা সেই মানুষগুলোর রক্ত পান করে।

এদের মাঝে মাঝে গভীর সমদ্রেও দেখা যায়। সেখানে এরা জাহাজ না জেলেদের নৌকা ডুবিয়ে দেয় আর সেই মানুষদের রক্ত ভক্ষণ করে।

৪৭. ফুনাউরেই

ভাষান্তর- জাহাজ ভূত।

অন্যান্য নাম-আয়াকাশি।

আবাস- সমুদ্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

যখন কোন মানুষের সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয়, তখন সেই মানুষের অতৃপ্ত আত্মা পরিবর্তিত হয় এক হিংস্র প্রেতে। এদের বলা হয় ফুনাউরেই। এরা সাধারণত সেই সব নাবিকের প্রেত হয় যারা জলে ডুবে মারা গেলেও তাদের আত্মা অপেক্ষা করে থাকে তাদের বন্ধু আর পরিজনদের। সেই সব মানুষকে জলে দেখলে এরা সেই জাহাজ ডুবিয়ে তাদেরও নিজেদের দলে সামিল করে। এদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে এদের দেখতে হয় সাদা মৃতদের পোশাক পরা লাশের মত। এদের সাধারণত পূর্ণিমার রাতে অথবা ঝড়ের রাতে সমুদ্রে দেখা যায়। দূর দেখে দেখে এদের এক দলা কুয়াশা বলেই মনে হয়। তবে এরা যত কাছে আসতে থাকে, তখন সেই কুয়াশা আস্তে আস্তে ধরতে থাকে এদের আসল রূপ।

মানুষের মুখোমুখি-

এরা একত্রিত হয় একটা ভূতুড়ে জাহাজে করে ঘুরে বেড়ায়। এদের শিকার করার ধরনও ভিন্ন। মাঝে মাঝে এরা এদের সেই জাহাজ নিয়ে সোজাসুজি ধাক্কা মারে অন্য জাহাজকে। বাঁচার জন্য সেই জাহাজ ঘোরাতে গেলেই জলের তলার পাথরে লেগে

সেই জাহাজ ডুবে যায়। আবার কখনও এরা এদের জাহাজ নিয়ে চলে আসে মানুষের জাহাজের কাছাকাছি। তারপর এরা এদের লম্বা হাত দিয়ে মানুষকে সেই জাহাজ থেকে টেনে নেয় নিজেদের জাহাজে। এদের কাছে সব সময় বড় বড় বালতি থাকে যা দিয়ে এরা মানুষের জাহাজে সমুদ্রের জল ঢেলে দেয়।

কোন কোন সময় এরা আবার একাও শিকার করে। এরা তখন নিজেদের দেহের আকার বাড়িয়ে হয়ে যায় পর্বতসম। তারপর সেই বিশাল দেহ নিয়ে এরা আক্রমণ করে ভেসে আসা জাহাজকে। এরা সেই জাহাজ থেকেই একটা বড় বালতি নিয়ে সেই বালতি করে সমুদ্রের জল ঢেলে দেয় জাহাজে। যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই জাহাজ ডুবে যায়।

এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য জাহাজের নাবিকরা এমন বালতি সাথে নিয়ে যায় সে বালতির তলায় ফুটো আছে। তাই এদের থেকে বালতি নিলেও ফুনাউরেই সেই বালতি দিয়ে কখনোই তাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারবে না।

৪৮. নিনগ্যো

ভাষান্তর- মৎসকন্যা বা মৎসমানব।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- সমুদ্র।

খাদ্য- সামুদ্রিক প্রাণী।

চেহারা-

নিনগ্যো হল জাপানী উপকথার মৎসকন্যা। তবে পশ্চিমের উপকথায় যে মৎসকন্যাদের দেখা যায়, তাদের সাথে এই নিনগ্যোদের আছে বিশাল ফারাক। পশ্চিমের উপকথার মৎসকন্যাদের কোমরের নীচের দিকটা হয় মাছের আর উপরের দিকটা হয় সুন্দরী যুবতীর। তবে জাপানী উপকথায় নিনগ্যোরা হল ভয়ানক কুৎসিত প্রাণী। এদের বর্ণনা ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন। কোথাও এদের মুখটা হয় কুৎসিত মাছের মত আবার কোথাও এদের দেখতে হয় মানুষের মত আর হাতে থাকে লম্বা ধারাল নখ।

মানুষের মুখোমুখি-

নিনগ্যোদের প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী পাওয়া যায় প্রাচীন জাপানের ইতিহাসেও। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে রচিত জাপানী পুঁথি 'নিহো শোকি'-তে পাওয়া যায় প্রথম নিনগ্যোর কাহিনী। উপকথায় বলা হয়েছে যে এই নিনগ্যোদের মাংস নাকি চিরযৌবন এনে দেয়। তবে সেই মাংস খেতে চাওয়ার একটা কুফলও আছে। বলা হয় নিনগ্যোরা এদের দেহকে ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে বেঁধে রাখে, তাই কোন মানুষ এদের ধরতে গেলে বা এদের মেরে মাংস ভক্ষণ করতে গেলে তার উপর নেমে আসে ভয়ানক অভিশাপ।

একটি উপকথায় বলা হয়েছে যে একজন জেলে একবার ভুল করে একটি নিনগ্যোকে বাড়ি নিয়ে আসে। আর তার ফলে সেই জেলের গোটা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায় ভূমিকম্পে।

৪৯. ইসোনাডে

ভাষান্তর- সৈকতে আঘাতকারী।

অন্যান্য নাম- ওকুচি ওয়ানি।

আবাস- সমুদ্রে, তবে সৈকতের কাছাকাছি।

খাদ্য- মাংসাশী।

চেহারা-

ইসোনাডে হল হাঙরের মত দেখতে এক শ্রেণীর সামুদ্রিক দানব যারা পাথুরে সমুদ্র সৈকতে বসবাস করে আর অপেক্ষা করে মানুষের নৌকার। এদের দেহটা আকারে বৃহৎ আর সেই দেহ ঢাকা থাকে আঁশ আর কাঁটায়। দেহের এই কাঁটাই এরা এদের শিকারের শরীরে বিঁধিয়ে দেয় আর তারপর তাকে টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রে। সেখানে গিয়ে এরা সেই শিকারকে ভক্ষণ করে।

স্বভাব-

ইসোনাডেদের দেহটা বৃহৎ হলেও এদের ধরা খুব একটা সহজ নয়। এরা জলের মধ্যে খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে আর সেই সাঁতারের সময় জলে কোন ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় না, যার ফলে এরা ঠিক কোথায় আছে সেটা জানাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এদের কাছাকাছি কোন জাহাজ এলে এরা মুহূর্তের মধ্যে এদের বিরাট লেজ দিয়ে সেই জাহাজে আক্রমণ করে। এদের গায়ের কাঁটা বিঁধে যায় বিভিন্ন মানুষের শরীরে আর সেই কাঁটাবিদ্ধ মানুষদের নিয়ে ইসোনাডে চলে যায় জলের তলায়।

৫০. কোরমোডাকো

ভাষান্তর- কাপড়ের অক্টোপাস।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- সমুদ্র।

খাদ্য- মাংসাশী।

চেহারা-

কোরমোডাকো হল এক ধরণের অদ্ভুত দর্শন অক্টোপাসের মত দেখতে প্রেত। এরা সাধারণত বসবাস করে ক্যোটো আর কুকুই প্রদেশের সমুদ্র বা মোহনায়। এদের দেখতে হয় সাধারণ অক্টোপাসের মত। এই প্রজাতির পুরুষরা কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা হলেও এদের স্ত্রী'রা হয় এদের দেহের প্রায় পাঁচ গুণ। এদের দেহের আকার ছোট বলে এরা ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। এদের স্ত্রী জাতিদের দেহ ঢাকা থাকে একটা পাতলা খোলসে।

স্বভাব-

এরা নিজে থেকে মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে এদের কাছাকাছি কোন মানুষ এসে গেলে এরা খুবই হিংস্র হয়ে ওঠে। এরা তখন ধীরে ধীরে নিজেদের আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকে। এরা এক সময় এতটাই বড় হয়ে যায় যে এরা একটা গোটা মানুষ গিলে নিতে পারে। এরা এদের শুঁড় আর দেহ বড় করে দিলে এদের দেখে মনে হয় একটা পাতলা কাপড়ের মত। সেই থেকে এদের নাম কোরমোডাকো। এরা এদের বৃহৎ আকার ধারণ করলে একটা গোটা জাহাজকেও গিলে ফেলতে পারে। এরা এদের শুঁড় দিয়ে

সেই জাহাজ আর তার নাবিকদের পেঁচিয়ে নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের নীচে। খাওয়া হয়ে গেলে, কোরমোডাকোরা আবার তাদের ক্ষুদ্র আকারে ফিরে আসে।

৫১. উমি বোজু

ভাষান্তর- সমুদ্রের সন্ন্যাসী।

অন্যান্য নাম-উমি ন্যুডো, উমি হোশি।

আবাস- সমুদ্র।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

জাপানের যত সামুদ্রিক প্রেতের কথা জানা যায়, তার মধ্যে এই উমি বোজু-ই হল সব থেকে রহস্যময়। এদের আসল রূপ কেমন সেটা কেউ জানে না, কারণ এরা যখন জল থেকে উপরে ওঠে, তখন শুধু এদের বৃহৎ মাথাটাই দেখা যায়; বাকি দেহ থাকে জলের তলায়। এদের চামড়ার রং হয় কালো আর মুখ জুড়ে থেক দুটো বড় গোলাকার চোখ। এদের মাথা হয় মসৃণ, অনেকটা মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীর মত।

মানুষের মুখোমুখি-

উমি বোজু সাধারণত দেখা দেয় শান্ত রাতে। হঠাৎ করে শান্ত একটি রাতে সমুদ্রের ঢেউ আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে আর তার সাথে শুরু হয় বজ্রপাত। এই সময় সমুদ্রের মাঝ থেকে উঠেতে শুরু করে একটি বৃহৎ আকার প্রাণী। এরা উঠে সমুদ্রে ভেসে চলা জাহাজ ধ্বংস করে দেয়।

কিছু উপকথা বলা হয়েছে এদের দেহটা হয় সর্পিল আবার অন্য কিছু কাহিনী অনুযায়ী এদের দেহ হয় বিরাট আর অবর্ণনীয়। ফুনাউরেই-র মত এরা নাবিকদের থেকে বালতি চেয়ে সেই বালতি দিয়েই জাহাজে জল ঢেলে জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

কিছু উপকথা অনুযায়ী, উমি বোজু হল সেই সব সন্ন্যাসীর আত্মা যারা জলে ডুবে মারা যায়, অথবা যাদের গ্রামের মানুষেরা দ্বীপান্তরিত করে। এই বিতাড়িত সন্ন্যাসীরা তখন ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় পাগল হয়ে আস্তে আস্তে মারা যায়। এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর পর এদের আত্মা পৃথিবীর গন্ডি ছেড়ে বেরতে পারে না। এরা তখন পরিবর্তিত হয় প্রেতে। আবার অন্যান্য কিছু উপকথা অনুযায়ী, উমি বোজু হল এক শ্রেণীর ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক দানব যারা বসবাস করে সমুদ্রের গভীরে।

৫২. বাকেকুজিরা

ভাষান্তর- তিমির ভূত।

অন্যান্য নাম-হোনে কুজিরা।

আবাস- সমুদ্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

বাকেকুজিরা হল তিমিমাছের কঙ্কাল যারা মাঝে মাঝে সমুদ্রের উপর ভেসে ওঠে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য। এই নিঃশ্বাস নেওয়াটা প্রেতের জন্য জরুরি না হলেও জীবিত কালের অভ্যাসবশত এরা এটা করে থাকে।

মানুষের মুখোমুখি-

প্রাচীন কালে যখন তিমি মাছের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, তখন গ্রাম্য জেলেরা তিমি মাছের দেখা পাওয়াকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখত। কারণ একটি তিমি মাছ ধরতে পারলে তার মাংস আর তেল বিক্রি করে তারা অনেক টাকা রোজগার করতে পারত। তবে সেই সময় একাধিক জেলে দাবী করেছিল যে তারা মৃত তিমি মাছের আত্মা দেখতে পায় সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে। এদের বলা হয় বাকেকুজিরা। এরা হয় প্রতিশোধপরায়ণ। এরা সেইসব মানুষ খুঁজে বেড়ায় যাদের জন্য এদের মৃত্যু হয়েছিল। যারা এদের দেখতে পায়, তাদের জীবনে নেমে আসে কঠিন অভিশাপ। আর এরা গ্রামে ফিরে এলে সেই অভিশাপ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের অন্য মানুষদের মধ্যেও। এই অভিশাপের ফলে গ্রামে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকান্ড অথবা ভূমিকম্প।

৫৩. নুরারিহ্যোন্

ভাষান্তর- পিচ্ছিল লাউ।

অন্যান্য নাম-নুরিহ্যোন।

আবাস- প্রাসাদ, পতিতাপল্লি।

খাদ্য- দামি খাদ্যসামগ্রী।

চেহারা-

নুরিহ্যোন হল এক শ্রেণীর রহস্যময় আর সেই সাথে শক্তিশালী প্রেত। এদের কাহিনী পাওয়া যায় সমগ্র জাপান জুড়ে। কথায় বলা মানুষের রূপ থেকে তার ব্যবহারের বিচার করতে নেই। এই নুরিহ্যোন নামক প্রেতটি ঠিক এই কথাটির একটি উদারহন। এদের দেখতে হয় একজন ভদ্রঘরের শান্ত বৃদ্ধের মত, তবে এদের মাথাটা হয় লম্বাটে। এছাড়াও এদের মুখে থাকে একাধিক বলিরেখা। তবে এদের মুখটা ভালো করে দেখলে বোঝা যায় সেই মুখের আদল অনেকটা বৃদ্ধ পুরুষ আর মাছের মিশেলে তৈরি। এদের পরনে থাকে দামী পোশাক বা কিমোনো আর এদের ব্যবহার হয় একজন রুচিশীল ভদ্রলোকের মতই।

স্বভাব-

নুরিহ্যোন হল প্রেতদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী। এরা যাতায়াত করে দামী পাল্কিতে আর সেই পাল্কি বয়ে নিয়ে চলে মানুষ। এরা সাধারণত পতিতা পল্লীতে যায় আবার কখনও সাধারণ মানুষের বাড়িতে যাতায়াত করে। এদের বলা হয় 'কাইবুতসু নো অ্যাদামা' মানে প্রেতদের নেতা। সব প্রেতরাই এদের কথা শুনে চলে আর এদের নেতা

হিসেবেও সম্মান করে।

মানুষের মুখোমুখি-

নুরিহ্যোন দেখা দেয় ঠিক সন্ধ্যের মুখে যখন বাড়ির সবাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। এরা সেই বাড়ির সামনে হঠাৎই এসে হাজির হয় এদের দামি পাল্কিতে চড়ে। আর কেউ কিছু বোঝার আগেই এরা ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। ঘরে ঢুকে এরা এমন ব্যবহার করে যেন এরা সেই বাড়ির মালিক। এরা সেই বাড়িতে রাখা দামী খাদ্য আর পানীয় ব্যবহার করতে থাকে। এদের ঐন্দ্রজালিক শক্তি এতটাই বেশি যে এই সময় সেই বাড়ির আসল মালিকও কিছু করতে পারে না। যদিও বাড়ির মালিক বুঝতে পারে নুরিহ্যোনদের আগমনে কথা, সব সম্মোহিত থাকার কারণে তারাও চাকরের মতই ব্যবহার করতে থাকে। কিছুক্ষণ বসবাস করার পর নুরিহ্যোনরা আবার নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজেদের আস্তানায় চলে যায়। এরা চলে যাওয়ার পর বাড়ির মালিকরা বুঝতে পারে যে তাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ আগে যে বৃদ্ধটি এসেছিল সে আসলে একটি নুরিহ্যোন।

৫৪. ওহাগুরো বেত্তারি

ভাষান্তর- শুধু কালো দাঁত।

অন্যান্য নাম-নোপ্পেরা বো।

আবাস- মন্দিরের পাশের অন্ধকার গলি।

খাদ্য- জানা নেই।

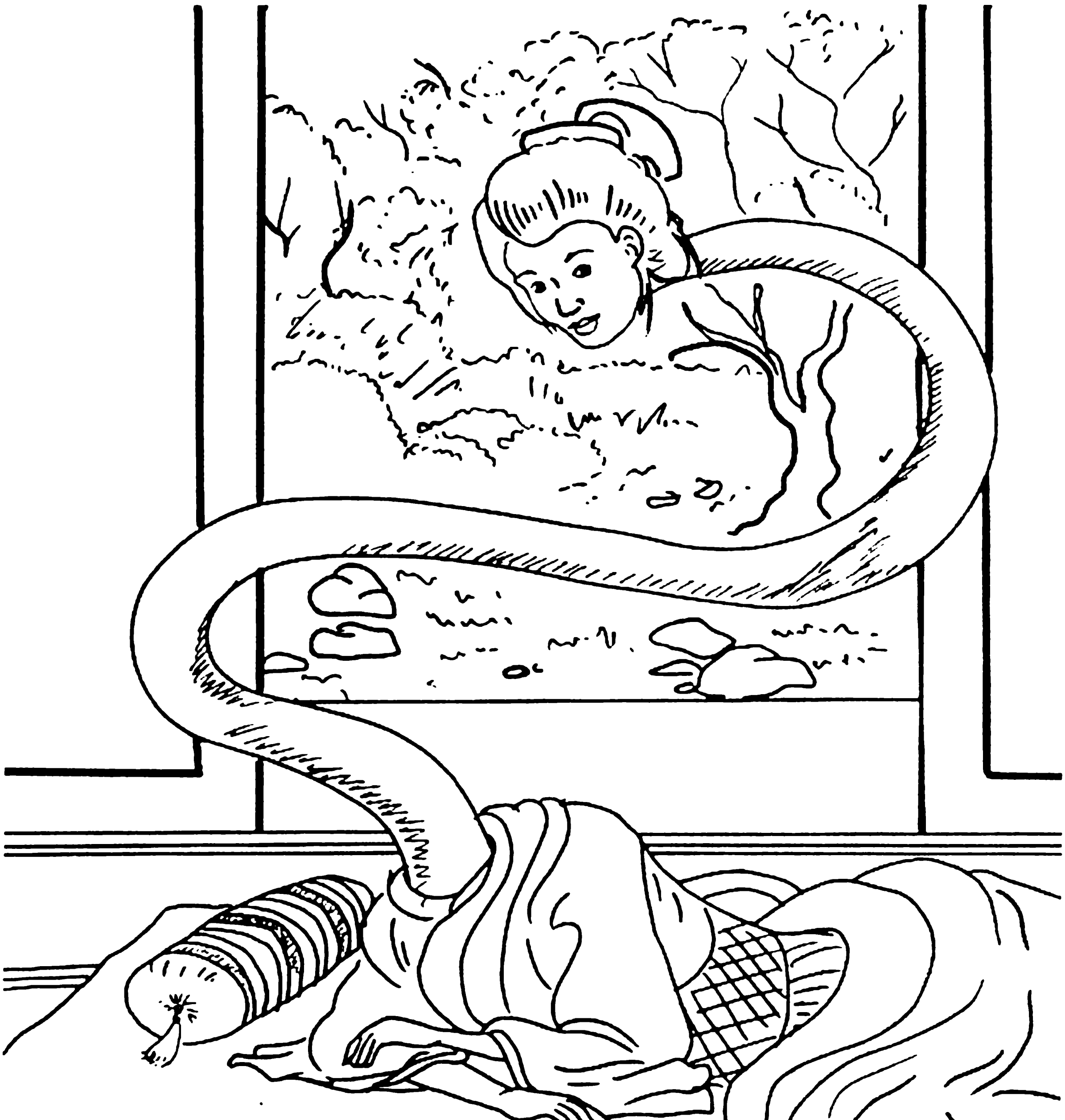
চেহারা-

গভীর রাতে মন্দিরের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় দামী পোশাকে সুজজ্জিত এক নারী মূর্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরা একাকী যুবকদের দেখলে কাছে ডাকে। এদের চোখে থাকে সম্মোহনী শক্তি যার ফলে এদের ডাক উপেক্ষা করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। পিছন থেকে ওহাগুরো বেত্তারিদের দেখলে মনে হয় কিমোনো পরিহিতা কোন যুবতী। তবে এদের পোশাক বেশিরভাগ সময় যত নববধূর মত। এরা মন্দিরের পাশের কোন আধো অন্ধকার গলিতে অপেক্ষা করে। আবার কোন কোন কাহিনী অনুযায়ী, এরা কোন মানুষের স্ত্রী'র রূপ ধরে তার বাড়িতেও ঢুকে যায়।

প্রথমে এরা এদের শিকারের থেকে এদের মুখটাকে আড়াল করে রাখে। এদের ডাক শুনে কোন মানুষ যদি এদের কাছে এসে এদের মুখ দেখতে চায়, তখন এরা এদের কুৎসিত ফ্যাকাসে মুখটা তাদের সামনে তুলে ধরে। এদের চড়া মেকআপওয়ালা মুখে শুধু থাকে একটা মুখ গহ্বর আর সেই মুখ গহ্বরের মধ্যে থাকে এক সারি কালো দাঁত।

উপকথায়-

ওহাগুরো বেত্তারি হল অনেকটা নেপ্পেরা বো'র মত প্রেত যারা অন্য মানুষকে ভয় দেখিয়ে আনন্দ পায়। এরা হল সেই সব নারীর প্রেত যাদের কুৎসিত দেখতে হওয়ার কারণে জীবিত কালে বিবাহ হয়নি। তবে এরা মানুষকে ভয় দেখালেও সাধারণত মানুষ খুন করে না।



রোকুরোকুবি

৫৫. রোকুরোকুবি

ভাষান্তর- কুমোরের চাকার গলা।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- সর্বত্র; সাধারণত পতিতাপল্লীতে।

খাদ্য- দিনের বেলা সাধারণ খাবার; রাতের বেলা প্রদীপের তেল।

চেহারা-

রোকুরোকুবিদের দিনের বেলায় দেখলে মনে হয় একজন সাধারণ মানবীর মত। তবে রাতের বেলায় যখন এদের দেহটা ঘুমে ঢলে পড়ে, তখন এদের গলা আস্তে আস্তে লম্বা হতে থাকে। আর সেই গলায় ভয় করে এদের মাথা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও এদের মাথাটা ছোট কোন পশুকে আক্রমণ করে। আবার কখনও এরা প্রদীপ থেকে ঝরে পড়া তেল চেটে খায়।

উপকথায়-

রোকুরোকুবিরা অন্য কিছু দানবের মত দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। এরা মানব নারী হয়েই জন্মগ্রহণ করে, তবে পরবর্তী জীবনে কোন এক অভিশাপের পর এরা পরিবর্তিত হয় রোকুরোকুবিতে। এই অভিশাপের কারণ হিসেবে থাকে তাদের কুকর্ম; কখনও তারা সরাসরি দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আবার কখনও তারা তাদের স্বামীকে ঠকিয়ে পরপুরুষের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এদের স্বামী বা পিতার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে এরা পরিবর্তিত হয় রোকুরোকুবিতে। একটি উপকথার কাহিনী অনুযায়ী, একদিন এক গৃহকর্তা লক্ষ্য করেন যে তার বাড়ির প্রদীপ

থেকে রোজই চুরি যাচ্ছে তেল। তখন সে বাড়ির এক পরিচারিকাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। সে সেই পরিচারিকার উপর লুকিয়ে নজর রাখতে শুরু করে। একদিন রাতে সে লক্ষ্য করে যে সেই মেয়েটার ঘুমিয়ে পড়লে তার দেহের চারিপাশে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে একটা বলয়। কিছুক্ষণ পর সেই মেয়েটা পাশ ফিরলেও তার মাথাটা একই রকম থেকে যায়। আর এই ফলে তার গলাটা বেশ কিছুটা লম্বা হয়ে যায়। পরের দিন সেই গৃহকর্তা সেই পরিচারিকাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়। মেয়েটা নিজেও বুঝতে পারে না যে রাতের বেলা ঘুমানোর পর সে পরিবর্তিত হয় একটি রোকুরোকুবিতে।

৫৬. নুকেকুবি

ভাষান্তর- বিছিন্ন মাথা।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- দিনের বেলায় সাধারণ খাবার আর রাতে রক্ত।

চেহারা-

নুকেকুবি হল রোকুরোকুবির একটা শ্রেণী। এদের বাকি বৈশিষ্ট্য রোকুরোকুবিদের মত হলেও এদের গলা লম্বা হয় না। তার বদলে এদের মাথাটা দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায় আর সেই মাথা ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র। যেহেতু এদের মাথাটাই দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাই এরা রোকুরোকুবিদের থেকে আরও অনেক দূর অবধি যাতায়াত করতে পারে।

স্বভাব-

নুকেকুবিদের থাকে প্রচণ্ড রক্ত তৃষ্ণা। আর এরা রোকুরোকুবিদের থেকে অনেক বেশি হিংস্র প্রকৃতির হয়। এদের বিছিন্ন মাথাটা বিভিন্ন মানুষের শরীর থেকে রক্ত চুষে খায়। এদের কামড়ে পশু কিংবা মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

উপকথায়-

জাপানের ফুকুই প্রদেশের একটি প্রখ্যাত উপকথার কাহিনী আছে এই নুকেকুবি নিয়ে। একবার এক যুবতীর কোন এক অভিশাপের ফলে পরিবর্তিত হয় নুকেকুবিতে।

প্রদেশের রাজধানীতে প্রতি রাতে তার বিছিন্ন মাথাটি ঘুরে বেড়াত আর পথচারী যুবকদের তাড়া করে তাদের বাড়ি অবধি চলে যেত। ঘরে ঢুকতে না পারলে তারা তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে দেই বাড়ির দরজা কামড়াত। পরের দিন সকালে উঠে বাড়ির লোকেরা দেখত যে বাড়ির মূল দরজার উপর একাধিক দাঁতের দাগ। যখন সেই যুবতীটি নিজের এই অভিশাপের কথা জানতে পারল, তখন লজ্জায় সে তার স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইল। সে ঈশ্বরের কাছে মানত করে নিজেই নিজের চুল কেটে ফেলে আত্মহত্যা করে। তার মতে এইভাবে দানব রূপে বেঁচে থাকার থেকে মৃত্যু অনেক ভালো।

হিতাছি প্রদেশের একটি উপকথায় বলা হয়েছে একবার একজন মানুষের সাথে একটি নুকেকুবির বিবাহ হয়।



ফুতাকুছি ওন্না

৫৭. ফুতাকুছি ওন্না

ভাষান্তর- দুটি মুখ বিশিষ্ট নারী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- সাধারণ খাবার।

চেহারা-

ফুতাকুছি ওন্না হল এক ধরণের অদ্ভুত প্রেত যারা সব সময় একটি বিবাহিত নারীর রূপ ধরেই থাকে। এদের দেহ বৈশিষ্ট্যও একটি সাধারণ নারীর মত, তবে এদের একটার জায়গায় দুটো মুখ থাকে; একটি সামনে আর একটি মাথার পিছন দিকে চুলের আড়ালে। এই লুকানো মুখটার থাকে বড় বড় ধারাল দাঁত আর মোটা ঠোঁট। এই দ্বিতীয় মুখটার ক্ষুধা খুবই বেশি। সেই নারীর মাথার চুলগুলো হয় শুঁড়ের মত ব্যবহার করে সেই লুকানো মুখটা খাবার চুরি করে খায়।

উপকথায়-

একটি উপকথার কাহিনীতে বলা হয়েছে একদা ফুকুশিমা নামক গ্রামে এক কৃপণ মানুষ বসবাস করত। যেহেতু পরিবার থাকলে তাদের পয়সা খরচ করে খাওয়াতে হবে, তাই সে একাই থাকত। একদিন তার সাথে এমন এক নারীর দেখা হয় সে প্রায় সারাদিন কিছু না খেয়েই থেকে যেত। কিন্তু কিছু না খেয়েও সেই নারীটি সারাদিন বিভিন্ন কাজ করতে পারত। সে সেই মেয়েটিকে বিবাহ করে। কিন্তু তারপর থেকে সে লক্ষ্য করে যে তার বাড়ির খাবার রোজই কমে কমে যায়। এই খাবার কমে যাওয়াটা সেই ব্যক্তির কাছে

খুবই রহস্যজনক মনে হল। একদিন সে কাজে যাওয়ার নাম করে বাড়ির কাছেই লুকিয়ে থাকল। কিছু পরে নিজের বাড়ির জানলার কাছে এসে সে দেখে যে তার স্ত্রী সযত্নে নিজের লম্বা কেশ উন্মুক্ত করে দিল আর সেই কেশের ফাঁক দিয়ে দেখা দিল একটা ভয়ঙ্কর দাঁত-ওয়ালা মুখ। তারপর তার স্ত্রীর চুলগুলো শুঁড়ের মত ঘুরে ঘুরে ঘর থেকে খাবার এনে সে রাক্ষুসে মুখটার তুলে দিতে লাগল। এই দেখে সে তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে সে ফুতাকুছি ওন্না সেই লোকটাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় কোন এক দুর্গম পাহাড়ে।

৫৮. হারি ওনাগো

ভাষান্তর- হুক-ওয়ালা মেয়ে।

অন্যান্য নাম-হারি ওন্না।

আবাস- রাস্তা, গলি।

খাদ্য- যুবক।

চেহারা-

গভীর রাতে শুকোকু প্রদেশের রাস্তায় দেখা যায় হারি ওনাগো নামক ভয়ঙ্কর প্রেতটিকে। অন্ধকারের মধ্যে এদের দেখে সাধারণ কোন যুবতী বলেই মনে হয়। শুধু যেটা সাধারণ যুবতীর থেকে আলাদা হয় সেটা হল এদের লম্বা অবিন্যস্ত কেশরাশি। আরও ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে এদের প্রতিটি চুলের ডগা আসলে এক একটা হুক।

মানুষের মুখোমুখি-

হারি ওনাগোরা রাতের অন্ধকারে পথে ঘুরে বেড়ায় শিকার করার জন্য। এদের শিকার হল একাকী যুবক। যখন নিজের শিকার দেখতে পায়, তখন এরা তাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে। যদি সেই যুবকটি তার হাসির জবাব দেয়, তাহলে এরা এদের হুক বিশিষ্ট চুল দিয়ে তাকে আক্রমণ করে। এদের চুল আলোর গতিতে এগিয়ে এসে সেই যুবকটির দেহের মাংসে আটকে যায়। এদের দৈহিক শক্তি এতটাই হয় যে একজন মানুষকে এরা খুব সহজেই নিজের চুলের দ্বারা আক্রমণ করতে পারে। যখন এদের চুলের আঘাতে সেই যুবকটি অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন এরা সেই শিকারটিকে এদের

চুলের সাহায্যে একাধিক টুকরে বিভক্ত করে দেয় আর অবশেষে তাদের ভক্ষণ করে।

এদের হাত থেকে বাঁচা খুবই দুষ্কর। তবে এদের চুল এসে আক্রমণ করার আগে কোন মানুষ যদি কোন বাড়িতে ঢুকে যেতে পারে, তাহলে এরা এদের শিকারকে ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৫৯. কুচিসাকে ওন্না

ভাষান্তর- ঠোঁট কাঁটা নারী।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- অন্ধকার গলি।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

কুচিসাকে ওনা হল সেই সব নারীর প্রেত যাদের জীবিত কালে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল আর সেই জন্যে এরা মৃত্যুর পরে ফিরে এসে মানুষের উপর তার প্রতিশোধ নেয়। এদের দেখতে সাধারণ নারীর মত হলেও এদের মুখটা চেরা থাকে কান অবধি। এরা মুখের উপর একটা পাতলা কাপড় বেঁধে রাতের বেলায় অন্ধকার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

মানুষের মুখোমুখি-

কুচিসাকে ওন্নারা অন্ধকার গলির মধ্যে দিতে যাতায়াত করা একাকী যুবকদের সামনে এসে দাঁড়ায়, আর জিজ্ঞেস করে, ''আমাকে কি দেখতে সুন্দর?'' সেই পুরুষটি যদি এর উত্তরে হ্যাঁ বলে তাহলে এরা এদের মুখোশটা সরিয়ে এদের আসল রূপ দেখিয়ে দেয়। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, ''এবার বল, আমাকে কি দেখতে সুন্দর?'' এই বীভৎস রূপ দেখে যদি সেই পুরুষটি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, তাহলে কুচিসাকে ওন্না তাদের মুখটা চিরে দেয়। যদি সেই যুবক পরের প্রশ্নের উত্তরেও হ্যাঁ বলে, তাহলে কুচিসাকে ওন্না তাদের তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেও রাতের বেলায় সেই

যুবকের বাড়িতে গিয়ে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে।

যে সকল নারীদের মৃত্যু হয় অন্যন্ত যন্ত্রণার সাথে, তারাই মারা যাওয়ার পর পরিবর্তিত হয় কুচিসাকে ওন্নাতে। যদিও এডো সাম্রাজ্যের সময় বিভিন্ন কাহিনীতে কুচিসাকে ওন্নাদের আক্রমণকে বলা হয়েছে ইচ্ছাধারি কিতসুনের আক্রমণ। কিতসুনেরা নাকি কুচিসাকে ওন্নার রূপ ধরে যুবকদের আক্রমণ করত। বলা হয় কুচিসাকে ওন্নারা নাকি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, তাই এদের হাত থেকে বাঁচার উপায় হল এদের সামনে মিষ্টি কোন খাবার ছুঁড়ে দেওয়া। তখন এরা এদের শিকার মানুষটিকে ছেড়ে সেই মিষ্টি খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সেই ফাঁকে মানুষটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

৬০. হোনে ওন্না

ভাষান্তর- হাড় সর্বস্ব নারী।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- অন্ধকার গলি, গোরস্থান।

খাদ্য- নেই, তবে এদের যৌন ক্ষুধা মারাত্মক।

চেহারা-

হোনে ওন্না হল সেই সব নারীর আত্মা যারা মৃত্যুর পরেও তাদের জীবিত কালের ভালোবাসাকে ভুলতে পারে না। যার ফলে এরা মৃত্যুর পরেও সেই প্রিয় জিনিস বা মানুষটার সাথেই আটকে যায়। এদের জীবিত কালে যেরকম দেখতে ছিল, প্রেত হয়েও এদের ঠিক তেমনই দেখতে হয়। এরা সাধারণত সুন্দরী নারীর রূপেই থাকে। তবে যাদের মনে এই নারীর প্রতি কোন ধরণের আকর্ষণ কাজ করে না, তারাই শুধু দেখতে পায় এদের আসল রূপ- একটি মানুষের কঙ্কালের উপর আকটে থাকা দলা দলা মাংসওয়ালা শরীর।

মানুষের মুখোমুখি-

রাতের অন্ধাকারে হোনে ওন্নারা কবর থেকে উঠে এদের প্রিয় মানুষের বাড়ির আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রিয় মানুষটি এদের দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও, সেই ভয় অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। তখন এদের মধ্যে জেগে ওঠে সেই নারীর প্রতি ভালোবাসা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই হোনে ওন্নারা নিজেরাও বুঝতে পারে না যে এরা আসলে জীবিত নেই। এরা প্রেত হয়ে বসবাস করার পিছনে একটাই কারণ- প্রেম।

সারা রাত নিজের প্রেমিকের কাছে থেকে সকাল হওয়ার আগে আবার এরা ফিরে যায় এদের কবরে। এই অলৌকিক সঙ্গম চলতে থাকে দিনের পর দিন। তবে এই সঙ্গমের সময়, প্রতিরাতে এরা এদের প্রেমিকের শরীর থেকে একটু একটু করে শুষে নেয় জীবনশক্তি। অবশেষে এদের প্রেমিকরাও আস্তে আস্তে ঢোলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। আর তখন এই হোনে ওন্নারা তাদের প্রেমিকের সাথে মৃত্যুর পরের জগতে একাত্ম হতে পারে।

উপকথায় এই ধরনের কাহিনীতে সবসময় সেই প্রেমিকের মৃত্যু হয় না। গল্পে এই প্রেমিকের কোন চাকর বা বন্ধু দেখে ফেলে হোনে ওন্নার আসল রূপ। তবে এই হোনে ওন্নারা নিজেরাও বুঝতে পারে না যে এদের জন্য এদের প্রেমিকেরাও আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে। যে বাড়িতে একবার হোনে ওন্না আসে, সেই বাড়িটিকে এদের হাত থকে রক্ষা করার জন্য পবিত্র মন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিতে হয়।

৬১. কেরাকেরা ওন্না

ভাষান্তর- কর্কশ বা কুৎসিত নারী।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- পতিতাপল্লীর গলিতে।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

কেরাকেরা ওন্না হল বৃহৎ আকারের একটি কুৎসিত প্রেত যারা বসবাস করে পতিতাপল্লীতে। এদের কুৎসিত হাসির শব্দ থেকেই এদের নাম করণ। এদের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে এদের দেখতে হয় একজন বৃহৎ আকারের মধ্য বয়সী নারীর মত যার পরনে থাকে রঙচঙে কিমোনো। এছাড়াও এদের মুখে থাকে চড়া দাগের মেকআপ। এরা পতিতাপল্লীর অন্ধকার গলিতে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝেই কুৎসিত স্বরে গান গেয়ে ওঠে।

মানুষের মুখোমুখি-

জাপানের এডো সাম্রাজ্যের সময় তৎকালীন পতিতাদের জীবনসীমা ছিল মাত্র তেইশ বছর। কঠোর জীবনের সাথে সংগ্রাম করে এইসব নারীরা খুবই অল্প বয়সে মারা যেত। কাজের সময় যেমন ছিল বেশী সেরকমই কাজের মূল্যও ছিল খুবই কম। এর সাথে লেগে থাকত পুরুষদের অত্যাচার। যদি কোন পতিতা এই কঠিন জীবন অতিক্রম করে বৃদ্ধ বয়সে মারা যেত, তখন তাদের আত্মা এই পৃথিবীর গণ্ডি ছেড়ে বেরোতে পারত না। তারা মৃত্যুর পর পরিবর্তিত হয় কেরাকেরা ওন্নাতে।

যখন কোন পুরুষ এই পতিতাপল্লীর কোন অন্ধকার গলির মধ্যে দিয়ে একাকী যাতায়াত করে, তখন সেই গলিতে প্রতীক্ষারত কেরাকেরা ওন্না একটা কর্কশ স্বরে চিৎকার করে ওঠে। সেই শব্দ পায় একমাত্র সেই মানুষটাই। এই ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে বেশীরভাগ মানুষই অজ্ঞান হয়ে যায়। আর যদি সেই অজ্ঞান না হয় সেখান থেকে পালিয়েও যায়, তাহলেও তার কানে বাজতে থাকে সেই কর্কশ চিৎকারের শব্দ। ক্রমাগত এই চিৎকার শুনতে শুনতে সেই মানুষটি ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে যায়।

৬২. তাকা ওন্না

ভাষান্তর- লম্বা নারী।

অন্যান্য নাম-তাকাজো।

আবাস- পতিতাপল্লী।

খাদ্য- সাধারণ মানুষের মত।

চেহারা-

তাকা ওন্নাদের সাধারণত দেখতে হয় সাধারণ মানব নারীর মতই। তবে এরা ইচ্ছে মত এদের দেহকে লম্বা বা ছোট করতে সক্ষম। অন্যান্য পতিতাপল্লীর প্রেতের মত এদেরও এই এলাকার বাইরে খুব একটা দেখা যায় না।

স্বভাব-

তাকা ওন্নাদের বিশেষ করে দেখা যায় পতিতাপল্লীর ঘরের জানলায়। এরা সেই সব ঘরের জানলায় দেখা দেয়, যে ঘরে একটি পতিতা আর একটি পুরুষ যৌনকর্ম লিপ্ত। এরা সাধারণত চুপচাপ দেখা ছাড়া আর কিছু করে না। তবে কিছু উপকথা অনুযায়ী, এরা মানুষকে আক্রমণও করে। এরা পুরুষদের ভয় দেখিয়েই বেশি আনন্দ পায়।

উপকথায়-

তাকা ওন্নারা হল সেই সব নারীর আত্মা যাদের জীবিত কালে এতটাই কুৎসিত দেখতে ছিল যে তাদের বিবাহ হয়নি। শুধু তাই না, তাদের কুৎসিত রূপের জন্য তাদের

পতিতাপল্লীতেও স্থান হয়নি। তাই অন্যান্য সুন্দরী উপর রাগ আর হিংসায় তাদের আত্মা কলুষিত হয়ে পরিবর্তিত হয় এই তাকা ওন্নাতে। এরা অন্য মানুষের যৌন ক্ষুধা ভক্ষণ করে।

একটি উপকথার কাহিনীতে বলা হয়েছে যে একজন কাঠুরে কি করে বুঝতে পারল যে তার নিজের স্ত্রীই আসলে একটি তাকা ওন্না। একদিন সেই কাঠুরের সন্তান হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর এক এক করে বাড়ির চাকররাও উধাও হয়ে যেতে থাকে। কি হচ্ছে সেটা বুঝতে পারে না সেই কাঠুরে। তবে মনে মনে তার নিজের স্ত্রীকেই সন্দেহ হয়। একদিন রাতের বেলা সে না ঘুমিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল। সে লক্ষ্য করল যে তার স্ত্রী মাঝরাতে বিছানা থেকে নেমে হঠাৎ করে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিল। তারপর কিছুক্ষণ পর, নিজের শরীরটাকে লম্বা করে উঠে এলো কুয়োর মধ্যে থেকে। এই দেখে সেই কাঠুরে ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

৬৩. আমে ওন্না

ভাষান্তর- বৃষ্টি মানবী।

অন্যান্য নাম- আমে ওনবা।

আবাস- অন্ধাকার গলি।

খাদ্য- জানা নেই; তবে সম্ভবত বৃষ্টির জল আর মানব শিশু।

চেহারা-

আমে ওন্না হল এক শ্রেণীর অদ্ভুত প্রেত যারা বৃষ্টির রাতে দেখা দেয়। এরা যেখানেই যায় এদের পিছনে যায় বৃষ্টি। এরা মানব শিশুদের অপহরণ করে আর নিয়ে চলে যায় অজানার দেশে। এদের দেখতে হয় বৃষ্টির জলে চপচপে ভিজে এক বৃদ্ধার মত। এরা এদের হাত আর পায়ের থেকে বৃষ্টির জল চেটে খায়।

স্বভাব-

উপকথায় বলা হয় যে জাপানের পৌরাণিক কাহিনীতে একাধিক দেবদেবী আছেন যারা নিয়ন্ত্রণ করে বৃষ্টি। তবে এদের মধ্যে কিছু দেবী পরবর্তী কালে কলুষিত হয়ে যায়। এরাই তখন মানব জগতে নেমে আসে আমে ওন্না হয়ে।

এই কানে আমে ওন্নাদের বৃষ্টির দেবীও বলা হয়। তবে দেবদেবীর মত এরা মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। এদের সাথে আসা বৃষ্টি থেকে গ্রামের মাটি উর্বর হতে পারে, তবে এই বৃষ্টির আড়ালে এরা খুঁজে বেড়ায় সদ্যজাত কন্যা শিশুদের। এরা যদি কোন সদ্যজাত কন্যা শিশু দেখে, তাহলে এরা সেই শিশুটিকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় এদের নিজের জগতে।

আবার বলা হয় সে সব মায়ের থেকে তাদের সদ্যজাত শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তারাও আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয় আমে ওন্নাতে। এরা এদের শিশুকে হারানোর দুঃখে রাতের অন্ধকারে বস্তা হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এরা আবার মাঝে মাঝে অন্য লোকের বাড়িতে ঢুকে তাদের বাড়ির শিশুকে চুরি করে।

৬৪. বেতোবেতোসান

ভাষান্তর- পায়ের শব্দ।

অন্যান্য নাম- বিশাগাতসুকু।

আবাস- অন্ধকার গলি।

খাদ্য- ভয়।

চেহারা-

বেতোবেতোসান হল এক প্রকার দেহহীন প্রেত যাদের উপস্থিতি বোঝার এক মাত্র উপায় হল এদের চলাচলের শব্দ। কাঠের মেঝের উপর 'বেতো বেতো' শব্দ করে এরা হেঁটে চলে বেড়ায়।

মানুষের মুখোমুখি-

গভীর রাতে যে সকল মানুষ রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যায়, তারা এই প্রেতের উপস্থিতি টের পায়। তবে এরা মানুষের ক্ষতি করে না। এরা সেই মানুষটির পদশব্দের সাথে মিলিয়ে নিজেরাও 'বেতো বেতো' শব্দ করে। আর আস্তে আস্তে সেই মানুষটির দিকে এগিয়ে আসে। সেই মানুষটির জন্য এই অভিজ্ঞতা হয় ভয়ানক। এই পদ শব্দ সেই মানুষটিকে অনুসরণ করে চলে আর সে পিছন ফিরলেও কাউকে দেখতে পায় না।

বেতোবেতোসানরা ভয় দেখালেও নিজেরা খুব একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে না। তাই একবার যদি কেউ বুজতে পারে যে তাকে কোন বেতোবেতোসান অনুসরণ করছে, তাহলে তার উচিৎ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সেই প্রেতটিকে আগে চলে যাওয়ার আমন্ত্রণ দেওয়া। এটা বললে সেই প্রেত ধীরে ধীরে সেই মানুষটিকে অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়ে

নিজেরাই এগিয়ে চলে যায়।

উত্তর জাপানের ফুকুই প্রদেশে শীত কালের রাতে এই রকম আরও একটি প্রেতের কথা শোনা যায়। এরা পিছু নিজে 'বিশা বিশা' এই রকম শব্দ হয় বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে বিশাগাতসুকু।

৬৫. দোরোতাবো

ভাষান্তর- ধান ক্ষেতের সন্ন্যাসী।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- অব্যবহৃত ক্ষেত।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

দোরোতাবো হল সেই সব চাষীর আত্মা যারা জীবিত কালে প্রাণ দিয়ে নিজের ক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণ করত, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সেই ক্ষেত পড়ে থাকে অযত্নে। এদের চেহারাটা মানুষের মত হলেও এদের হাতে থাকে মাত্র তিনটে আঙুল। এছাড়া এদের একটি মাত্র চোখ থাকে। জাপানী উপকথায় বলা হয় যে মানুষের পাঁচটা আঙুল হল ক্রোধ, লোভ, অজ্ঞানতা, জ্ঞান আর সমবেদনার প্রতীক। এই দোরোতাবোদের তিনটে আঙুল হল এই ক্রোধ, লোভ আর অজ্ঞানতার প্রতীকী। এদের মধ্যে জ্ঞান বা সমবেদনা থাকে না।

স্বভাব-

দোরোতাবো ঘুরে বেড়ায় এই সব পরিত্যক্ত ক্ষেতে আর কাঁদতে থাকে। এরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে নিজেদের ক্ষেত ফেরত চায়। এরা এদের ক্ষেতগুলোতে সারা রাত পাহারা দেয় আর সেই ক্ষেতের বর্তমান মালিকের বাড়ি গিয়ে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। এরা এই ক্ষেতে ততদিন থাকে যতদিন না ক্ষেতের বর্তমান মালিক সেই ক্ষেত ফেলে পালিয়ে যায় অথবা এমন কাউকে বিক্রি করে দেয় যারা ক্ষেতের পরিচর্যা করবে।

৬৬. আকা শিতা

ভাষান্তর- লাল জিহ্বা।

অন্যান্য নাম-আকা কুছি।

আবাস- ধান ক্ষেত, অন্যান্য ক্ষেত।

খাদ্য- চাষী।

চেহারা-

আকা শিতা হল এক ধরণের রহস্যময় প্রেত যাদের দেখতে হয় বেশ অদ্ভুত। এদের দেহটা তৈরি হয় কালো মেঘ দিয়ে আর মাথাটা হয় ভয়ঙ্কর পশুর মত। এদের দেহে থাকে লোমের আধিক্য আর হাতে থাকে ছুঁচালো নখ। এদের চেহারার প্রাধান বৈশিষ্ট্য হল এদের মুখ গহ্বর থেকে বেরিয়ে থাকা একটি লম্বা লাল রঙের জিভ। এদের শুধু মুখ আর নখবিশিষ্ট হাতগুলোই দৃশ্যমান হয়; বাকি দেহ থাকে কালো মেঘের আড়ালে।

স্বভাব-

গ্রীষ্মকালের দুপুরে যখন জল বা বৃষ্টির জন্য মানুষ হাঁসফাঁস করে, তখন দেখা দেয় আকা শিতা। এরা সাধারণ কৃষকদের কাছে প্রতিশোধের প্রতীক, এরা জল বিরোধে শাস্তিদাতা হিসেবেও পরিচিত। আসলে জাপানের বিভিন্ন গ্রামে গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় খরা। তাই এখানকার চাষীরা আগে থেকেই লম্বা খাড়ি কেটে এদের জমির জন্য জল মজুত করে রাখে। তবে কোন কোন দুষ্ট কৃষক রাতের অন্ধকারে অন্য কৃষকের খাড়ির জল টেনে নেয় নিজের ক্ষেতের দিকে। এই ধরণের ঘটনার ফলে সেই চাষী আর তার

পরিবারের উপর নেমে আসে ক্ষুধার প্রকোপ। আর যে কৃষকটি জল চুরি করেছিল, তার উপর নেমে আসে পড়শীদের ক্রোধ। তবে কিছু কিছু জল চোর বুদ্ধি করে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যায় আর তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যেই আগমন হয় আকা শিতার। আকা শিতা নিজের লম্বা জিভের সাহায্যে সেই জল চোর কৃষকটির ক্ষেত থেকে শুষে নেয় সব জল।

৬৭. ওতোরোশি

ভাষান্তর- ভয়ঙ্কর।

অন্যান্য নাম- ওদোরোশি, ওদোরোদোরো, কেইপ্লাই।

আবাস- মন্দির, মঠ, বাড়ি।

খাদ্য- ছোট পশু, দুষ্ট মানুষ।

চেহারা-

ওতোরোশিকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তবে সর্বত্রই এদের পবিত্র আত্মা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এদের ভয়ঙ্কর পাশবিক রূপকে আরও ভয়ঙ্কর বানিয়ে দেয় এদের ঘাড়ের কাছে ঘন কেশর। এই কেশরে এদের প্রায় পুরো দেহটাই ঢেকে যায়। এদের দেহের রং হয় নীল বা কমলা। এদের চারটে পা থাকে আর সেই পায়ে থাকে ধারালো নখ।

স্বভাব-

যদিও বহু শতাব্দী ধরে এদের কাহিনী প্রচলিত হলেও এই রহস্যময় প্রাণীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ওতোরোশিরা ছদ্মবেশ ধরতে পারদর্শী তাই এরা নিজেরা না চাইলে এদের আসল রূপ কেউ দেখতে পায় না। এদের বিশেষ করে দেখা যায় প্রাসাদে উঁচু চুড়ায় অথবা মন্দিরের সিংহদ্বারে। এদের বসবাসের প্রিয় স্থান হল মন্দির বা মঠের বাঁকানো ছাদে, যেটা মানুষের পৃথিবী আর স্বর্গের দ্বার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

মানুষের মুখোমুখি-

ওতোরোশি হল মন্দির বা মঠের মত পবিত্র স্থানের রক্ষাকর্তা। এই সব স্থানের আসে পাশে ঘুরে বেড়ানো বন্য জন্তুদের এরা খেয়ে ফেলে। এরা পশুপাখি ভক্ষণ করলেও মানুষের উপর সচরাচর আক্রমণ করে না। তবে যদি এরা কোন দুষ্ট অথবা অনৈতিক মানুষকে এইসব মন্দিরের আশেপাশে দেখতে পায়, তাহলে এরা তাদের উপর লাফিয়ে পড়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলে।

৬৮. ওয়াইরা

ভাষান্তর- ভয়ঙ্কর।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- পাহাড়, পর্বত, মন্দির, মঠ।

খাদ্য- ছোট পশু আর দুষ্ট অসৎ মানুষ।

চেহারা-

ওয়াইরা হল এক ধরনের বিরলতম প্রজাতির প্রেত। এদের দেখতে হয় বৃহৎ কুৎসিত একটি পশুর মত। এদের দেহ হয় গরুর মত তবে এদের চারটে পা থেকে বেরিয়ে আসে একটি করে লম্বা ধারালো নখ। উপকথা অনুযায়ী, এদের পুরুষদের দেহের রং হয় বাদামী আর স্ত্রীদের দেহের রং হয় লাল।

স্বভাব-

এরা বসবাস করে কোন এক দুর্গম পাহাড়ের গুহায়, নয়তো কোন গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত মঠের আশেপাশে। এদের ওতোরোশিদের কাছাকাছি পাওয়া যায় আর বিশ্বাস করা হয় যে এরা মন্দিরকে রক্ষা করে দুষ্ট মানুষের হাত থেকে। এরা এদের লম্বা নখের সাহায্যে ছোট ছোট প্রাণী শিকার করে খাবার জন্য। উপকথায় বলা হয়েছে যখন কোন ব্যাঙ অনেক বছর বেঁচে থাকে, তখন তারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় ওয়াইরাতে।

৬৯. উয়ান

ভাষান্তর- নেই।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- পরিত্যক্ত মন্দিরে, পরিত্যক্ত বাড়িতে।

খাদ্য- ভয়।

চেহারা-

উয়ান হল জাপানী উপকথার একটি খুবই বিরল এবং স্বল্প পরিচিত প্রেত। এদের নামটা এসেছে অন্ধাকারে এদের মুখ থেকে বেরোনো 'উয়ান! ঊয়ান!' শব্দ থেকে। এদের দেখতে যে ঠিক কেমন সেই নিয়ে কোথাও কিছু লেখা নেই। প্রাচীন কালে এদের অশরীরী প্রেত হিসেবেই ভাবা হত। তবে এডো সম্রাজ্যের সময় বিভিন্ন চিত্রকর এদের দেহ দিলেও, এরা অশরীরী হিসেবেই থেকে গেছে উপকথার পাতায়।

মানুষের মুখোমুখি-

উয়ানদের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় পুরানো মন্দির কিংবা পরিত্যক্ত বাড়ির আশেপাশে। এরা সেই পথে যাতায়াত করা মানুষদের সামনে হঠাৎ করে এসে 'উয়ান' বলে চিৎকার করে ওঠে। এই আচমকা আক্রমনের ফলে বেশিরভাগ সময় সেই পথচারীটি অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে এই উয়ানদের সামনে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার আর কোন দিন জ্ঞান ফেরে না। এরা সেই মানুষটির জীবন শক্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। বলা হয় এদের 'উয়ান' শব্দের প্রতি উত্তরে যদি কোন মানুষ 'উয়ান' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, তাহলে এরা তৎক্ষণাৎ সেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৭০. হ্যাকুমে

ভাষান্তর- একশত চক্ষু।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- পরিত্যক্ত বাড়ি, পরিত্যক্ত মন্দির, গুহা।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

হ্যাকুমে হল এমন এক প্রেত যাদের দেহের পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা থাকে একাধিক চোখে। এই সব চোখের রং হয় হলুদ। এই চোখের নীচে থাকে একটি মানুষের দেহ। যখন এই চোখগুলো বন্ধ থাকে, তখন এদের দেখে মন হয় গোলাপি রঙের মাংসপিণ্ড।

স্বভাব-

হ্যাকুমেরা বসবাস করে প্রাচীন মন্দির আর এরা সেই মন্দিরকে চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করে। দিনের বেলায় এরা বাইরে বেরতে পারে না কারণ দিনের আলো এদের শতাধিক চোখ সহ্য করতে পারে না। এরা রাতের বেলায় বাইরে বেরিয়ে মানুষের পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

মানুষের মুখোমুখি-

হ্যাকুমেরা সচরাচর মানুষের সামনে আসতে চায় না। যদি এদের কাছাকাছি কোন মানুষ চলে আসে, তাহলে এদের দেহ থেকে একটা চোখ খুলে গিয়ে উড়ে যায় সেই

মানুষটির দিকে আর তার শরীরে আকটে যায়। চোখটি ততক্ষণ তার সাথে লেগে থাকে যতক্ষণ সেই মানুষটি সেই এলাকায় থাকে। সেই মানুষের সাথে ঘুরে ঘুরে চোখটি সেই এলাকায় হওয়া অপরাধের উপর নজর রাখে। যখন সেই চোখটি দেখে যে সেখানে কোন অনৈতিক কর্ম হচ্ছে না, তখন চোখটি ফিরে আসে হ্যাকুমের কাছে। এরা মানুষের কোন ক্ষতি না করলেও এদের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মানুষ খুবই ভয় পেয়ে যায়।

৭১. নুপ্লেপ্লো

ভাষান্তর- জাপানী ভাষার গালি।

অন্যান্য নাম- নুপ্লেফুহো।

আবাস- পুরানো মন্দির, গোরস্থান।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

নুপ্লেপ্লো হল এক শ্রেনীর অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর প্রেত। এরা বসবাস করে পরিত্যক্ত মন্দির অথবা অব্যবহৃত গোরস্থানে। এদের চেনা যায় অদ্ভুত চেহারা আর এদের দেহ থেকে বেরনো পচা গন্ধ থেকে। এই গন্ধটা হয় অনেকটা মাংস পচা গন্ধের মত। এদের দেখতে হয় বেশ বড় একটা মাংসের দলার মত। তবে এই মাংসের দলার হাত পা চোখ মুখ সবই থাকে। এদের হাত পা হয় অত্যন্ত মোটা আর এদের মুখও হয় খুবই অস্পষ্ট।

স্বভাব-

নুপ্লেপোদের শুধু রাতের বেলাতেই দেখা যায়। তবে এরা মানুষের কোন ক্ষতি সাধন করে না। এমনকি ইচ্ছে করে মানুষকে ভয়ও দেখায় না। এদের দেহের গন্ধে মানুষের যে দুর্গতি হয় সেটা দেখেই এরা আনন্দ পায়। তবে মাঝে মাঝে এরা এদিক ওদিক ছুটে বেড়িয়ে মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে।

মানুষের মুখোমুখি-

নুপ্লেপ্লো হল এক শ্রেনীর বিরল প্রেত। তাই উপকথায় এদের খুব একটা কাহিনী

পাওয়া যায় না। তবে এদের রূপ যে বীভৎস, সেই নিয়ে অনেক পুঁথিতেই বলা হয়েছে। উপকথায় যেসব কাহিনী পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে যে রাজারা তাদের বিরাট সৈন্যদল পাঠাত এই প্রেতকে কাবু করার জন্য। তবে ক্ষণিকের জন্য সেই প্রেত পালিয়ে গেলেও আবার ফিরে আসে তার পূর্ব বাসস্থানে। এদের দেখে সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই সংজ্ঞা হারাত। বাকিরা উন্মাদ হয়ে যেত এদের শরীরের গন্ধে। এরা সচরাচর মানুষের কোন ক্ষতি না করলেও, এরা খুবই দ্রুত চলাচল করতে সক্ষম। আর তাই এদের বন্দী করাও সহজ ব্যাপার নয়।

এডো সাম্রাজ্যের সময়কার কিছু ঔষর্ধ সম্পর্কিত পুঁথিতে বলা হয়েছে যে, এই নুপ্পেপোদের মাংস থেকে তৈরি করা যেতে পারে একাধিক ঔষধি। বলা হয়েছে এই মাংস খেলে মানুষের দেহের যে কোন অসুখ সারানো যেতে পারে।

৭২. হিতোৎসুমে কেজো

ভাষান্তর- এক চোখ ওয়ালা সন্ন্যাসী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

হিতোৎসুমে কেজো হল জাপানী উপকথার একটি এক চোখ-ওয়ালা ছোট্ট বামন আকারের প্রেত। এদের কাহিনী পাওয়া যায় জাপানের সর্বত্র। এদের মাথা হয় মুণ্ডিত আর পরনে থাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মত পোশাক। এদের মুখ গহ্বর থেকে বেরিয়ে থাকে লাল রঙের একটা জিভ আর এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের মুখের মাঝখানে থাকা একটা মাত্র বড় চোখ।

স্বভাব-

হিতোৎসুমে কেজোরা মানুষের বিশেষ ক্ষতি করে না। তবে এরা অন্ধকার রাস্তায় হঠাৎ এসে মানুষকে ভয় দেখাতে ভালোবাসে।

মানুষের মুখোমুখি-

মানুষকে ভয় দেখানো ছাড়াও হিতোৎসুমে কেজোরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। পূর্ব জাপানে বলা হয় প্রতি বছর ৮ই ডিসেম্বর রাতে, এদেরকে রাস্তায় ঘুরে

বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন পরিবারের সেই বছর ভালো যায় না। হিতোৎসুমে কেজোরা সেই খবর পৌঁছে দেয় দুর্ভাগ্যের দেবতার কাছে। সেই দেবতা তখন দুষ্ট, অসৎ মানুষের ভাগ্য লিখে দেয় একাধিক যন্ত্রণা আর দুর্ভাগ্য। আবার সৎ মানুষদের জন্য এরা পরের বছর নিয়ে আসে সৌভাগ্য। কাজ হয়ে গেলে এরা এদের সেই খাতা রেখে আসে পৃথিবীর রক্ষাকর্তা দেবতার কাছে। তাই প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একটি দিনে গ্রামের লোকেরা গ্রামের রক্ষাকর্তা দেবতার মন্দির পুড়িয়ে দেয়, এই আশায় যে সেই মন্দিরের সাথে হিতোৎসুমে কেজোর খাতাও পুড়ে যাবে।

৭৩. উবুমে

ভাষান্তর- গর্ভবতী নারী।

অন্যান্য নাম- ওবো, উম্মে, উগুমে, উবামে তোরি।

আবাস- যেখানে সে সন্তান প্রসব করে।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

যখন কোন নারী সন্তান প্রসবের সময় বা তার কিছু পরে মারা যায়, তাহলে সেই মায়ের আত্মারা মুক্তি পায় না। তাদের চিন্তা থাকে তাদের সদ্যজাত সন্তানদের নিয়ে। তারা তখন পরিবর্তিত হয় উবুমে নামক এই প্রেতে। এরা অন্ধকার বর্ষণের রাতে হাজির হয়। এরা একাধিক রূপে মানুষের সামনে আসতে পারে। কখনও এরা রূপ নেয় একটি শিশু কোলে করে থাকা ক্রন্দনরত নারীর; কখনও গর্ভবতী নারীর; আবার কখনও এরা রূপ নেয় একটি রক্তস্নাত নারীর যার হাতে থাকে একটি অনুন্নত ভ্রূণ।

এই রূপের বৈচিত্রগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি আর তার পাশাপাশি তাদের মৃত্যুর পরিস্থিতির কারণেও হয়। কোন কোন স্থানে কোন গর্ভবতী নারী মারা গেলে তাকে সেই অজন্মা ভ্রূণের সাথেই কবর দেওয়া হয়। অন্যান্য কিছু স্থানে কবর দেওয়ার আগে সেই নারীর পেট কেটে বের করে নেওয়া হয় সেই ভ্রূণ। তারপর সেই ভ্রূণটিকে সেই মৃত নারীর কোলের কাছে রেখে কবর দেওয়া হয়।

স্বভাব-

এই উবুমেরা সেই সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সেখানে এদের মৃত্যু হয়েছিল। আর

জীবিত মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে বেড়ায়। যদি কোন নারী সন্তান প্রসবের পরে মারা যায়, তাহলে সেই উবুমে তার জীবিত শিশুর রক্ষা করে। এরা বিভিন্ন দোকানে বা বাড়িতে ঢুকে খাবার নিয়ে আসে। খাবার কিনতে এরা যে টাকা দেয় সেগুলো আসলে শুকনো পাতা। এরা দোকান থেকে খাবার কিনে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই দোকানদার সেটা বুঝতে পারে। এদের কারোর শিশু অযত্নে থাকলে এরা তখন কোন জীবিত মানুষকে পথ দেখিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে আসে, যাতে সেই মানুষের সাহায্যে তার শিশু একটা ভালো পরিবার পায়।

যেখানে জন্মের সময় শিশু আর মা দুজনেই মারা যায়, সেই ক্ষেত্রে উবুমেদের দেখা যায় একটি মৃত শিশুর শব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। যখন এদের কাছাকাছি কোন মানুষ এসে যায়, তখন এরা সেই উবুবে সেই মানুষটির কোলে তার শিশুকে দিতে চায়। যদি সেই মানুষটি শিশুটিকে কোলে নেয়, তাহলে উবুমে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর সেই মৃত শিশুর ওজন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর অবশেষে সেই মানুষটি সেই ওজনের ভারে চাপা পড়ে মারা যায়।

৭৪. ওনরিয়ো

ভাষান্তর- প্রতিশোধ কামী প্রেত।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

ওনরিয়ো হল জাপানী উপকথায় প্রচলিত প্রেতদের মধ্যে ভয়ংকরতম। জীবিত কালে যে সব মানুষ প্রচণ্ড লোভ, হিংসা অথবা রাগের বশবর্তী হয়ে থাকে, মৃত্যুর পর তাদের আত্মা পৃথিবীর গন্ডি পেরিয়ে বেরতে পারে না। মুক্তি পাওয়ার বদলে এরা পরিবর্তিত হয় এক ভয়ঙ্কর, ঘৃণ্য প্রেতে। এদের বলা হয় ওনরিয়ো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। আবার কেউ খুন হলে বা আত্মহত্যা করলে তার আত্মা পরিবর্তিত হয় ওনরিয়োতে। তার এদের প্রেত দেহেও দেখা যায় তার জীবিত কালের ক্ষত।

মানুষের মুখোমুখি-

এদের একটা কাজ আর সেটা হল প্রতিশোধ। এরা এতটাই শক্তিশালী হয় যে ইচ্ছেমত এরা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। তবে এরা খুব সহজে মানুষকে মারে না। যে মানুষের উপর এদের রাগ থাকে, এরা তাদের দেয় লম্বা কষ্টকর জীবন। এরা সেই মানুষটিকে না মেরে আস্তে আস্তে শেষ করতে থাকে তার পরিবারকে। এরা যেখানে

থাকে সেই স্থানে এরা ছড়িয়ে দেয় একাধিক অভিশাপ। এই অভিশাপের ফলে সেই স্থানে সেই কেউ এলে তার দেহে বাসা বাঁধে কঠিন সব ব্যাধি, যার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই সেই মানুষটির মৃত্যু হয়। তবে সে একা মারা যায় না। এদের অভিশাপের ফলে বাসা বাঁধা ব্যাধি হয় সংক্রামক। এদের কোন সঠিক শিকার নেই। এরা যাকে কাছে পায় তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনেক ক্ষেত্রে এরা সেই সব প্রেমিকদের আত্মা হয় যারা জীবিত কালে তার প্রেয়সীকে কাছে পায়নি। তার ফলে এরা মৃত্যুর পর ওনরিয়ো হয়ে সেই নারীটির উপর চালাতে থাকে অকথ্য অত্যাচার।

৭৫. কাওয়াউসো

ভাষান্তর- নদীতে বসবাসকারী ভোঁদড়।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- নদী, জলাশয়।

খাদ্য- মাংসাশী; সাধারণত মাছ বা ছোট পশু।

চেহারা-

জাপানের গ্রাম্য এলাকায় পাওয়া যায় কাওয়াউসো নামক প্রাণীটিকে। এরা মোটামুটি এক মিটার লম্বা হয় আর এদের দেহ ঢাকা থাকে ঘন লোমে। এরা সচরাচর মানুষের সামনে আসতে পছন্দ করে না।

স্বভাব-

বলা হয় কোন ভোঁদড় যদি অনেক বছর বেঁচে থাকে, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে এদের মধ্যে জন্ম নেয় একাধিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এরা ইচ্ছে মত যে কোন কিছুর রূপ ধরতে সক্ষম আর সেই সেই সাথে অবিকল নকল করতে পারে অন্য পশু বা মানুষের গলা। এরা মদ্যপান করতে অত্যন্ত ভালোবাসে আর সেই মদ খুঁজতেই এরা মাঝে মাঝে চলে আসে মানুষের লোকালয়ে। এরা মানুষের সাথে মজা করতে ভালো বাসলেও সাধারণত এরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না।

মানুষের মুখোমুখি-

কাওয়াউসো'রা মানুষের সাথে মজা করতে ভালোবাসে। বিশেষ করে বিভিন্ন পশুর

ডাক নকল করে এরা মানুষদের ভয় পাইয়ে দেয়। এরা পরিচিত কোন মানুষের গলা করে মানুষদের ডাক দেয়, আর সেই গলা শুনে মানুষটি হকচকিয়ে যায়। এরা মাঝে মাঝে লণ্ঠনের রূপ ধরে মানুষের সাথে জঙ্গলের মধ্যে যায় আর তারপর হঠাৎ নিজেদের আসল রূপ ধরে সেই মানুষটিকে অন্ধকারে রেখে পালিয়ে আসে। এরা কখনও আবার সুন্দরী নারীর রূপ ধরে পুরুষদের কাছে ডাকে। সেই পুরুষরা সেই কাওয়াউসো রূপী নারীতে মুগ্ধ হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলে এরা এদের আসল রূপ ধরে হাসতে হাসতে পালিয়ে যায়।

কখনও কখনও এই কাওয়াউসোরা মানুষের ক্ষতিসাধনও করে। উপকথা অনুযায়ী, ইশিকাওয়া প্রাসাদের আশেপাশে একটি কাওয়াউসো নাকি এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরে একাকী পুরুষদের নিজে যেত জলের ধারে। তারপর তাদের কোন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এসে মেরে খেয়ে ফেলত। তারপর সেই মানুষদের আধ খাওয়া দেহ ভাসিয়ে দিত নদীর জলে। তবে এই ধরণের কাহিনী খুবই কম পাওয়া যায় জাপানের উপকথায়।

এরা সাধারণত লোকালয়ে এলে একটি বাচ্চা ভিখারীর রূপ ধরে থাকে আর এদের মাথায় থাকে বড় মত একটা খড়ের টুপি। এরা এই রূপে শহরে ঢুকে মদ সংগ্রহ করে। তবে এদের পরিচয় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। এরা তখন সেই প্রশ্নকর্তার বলা শেষ কথাগুলোই বার বার বলতে থাকে। এছাড়াও মুখ দিয়ে করতে থাকে বিভিন্ন শব্দ।

৭৬. নোপ্পেরাবো

ভাষান্তর- মুখহীন সন্ন্যাসী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- রাস্তা, দোকান, এরা মানুষের সাথে মিশে থাকে।

খাদ্য- নেই, কারন এদের কোন মুখগহ্বর থাকে না।

চেহারা-

এই নোপ্পেরাবো'দের দেখতে হয় সাধারণ মানুষের মত আর সেই জন্যেই এরা মনুষ্য সমাজে খুব সহজেই মিশে যেতে পারে। তবে এদের একটা জিনিস আছে যেটা আনুসের থেকে আলাদা আর সেটা হল এদের মুখশ্রী বলে কিছু হয় না। এদের মুখে থাকে শুধু মসৃণ চামড়া, চোখ, নাক কান বা মুখগহ্বরের কোন চিহ্ন থাকে না।

মানুষের মুখোমুখি-

এই ভয়ানক প্রেতদের দেখা যায় রাতের বলা ফাঁকা রাস্তায়। অন্যান্য বেশ কিছু প্রেতের মত এরাও মানুষকে ভয় দেখিয়েই আনন্দ পায়। এরা সাধারণত একটি পুরুষ বা নারীর রূপ ধরেই মানুষের সামনে আসে। আর পথ চলতি একাকী পথচারীর দিকে পিছন করে দাঁড়ায়। সেই পথচারী এদের দিকে এগিয়ে এলে এরা তার মুখোমুখি দাঁড়ায় আর এদের মুখ দেখে পথচারীটি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। তবে এরা মাঝে মাঝে নকল মুখোশ লাগিয়ে মানুষের সামনে আসে আর তারপর সেই মুখোশ সরিয়ে এদের আসল রূপ দেখায়।

এরা মাঝে মাঝে অনেকে মিলেও একটি মানুষকে ভয় দেখাতে আসে। এদের

একজনকে দেখে যখন ভয় পেয়ে সেই মানুষটি পালাতে যায়, তখন অন্য একজন নোপ্পেরাবো এসে তাকে জিজ্ঞেস করে তার ভয়ের কারণ। সেই যখন বলে যে সেই একটি মুখশ্রী বিহীন মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে, তখন সেই নোপ্পেরাবো নিজের মুখ দেখিয়ে বলা, ''দেখুন তো, এই রকম মুখই কি আপনি দেখেছিলেন?''

এরা মাঝে মাঝে পথ চলতি মানুষটির কোন পরিচিত মানুষের রূপ ধরেও আসে। আর তারপর মানুষটির সামনে ফিরে আসে নিজেদের আসল রূপে। এই ভাবে একের পর এক নোপ্পেরাবোর হাত থেকে বাঁচতে বাঁচতে লোকটি দৌড়াতে থাকে, যতক্ষণ না সে নিজের বাড়িতে পৌঁছায়।

৭৭. মুজিনা

ভাষান্তর- অনুসরণকারী।

অন্যান্য নাম-আনাগুমা, মামি।

আবাস- পাহাড় আর জঙ্গলে।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

মুজিনা হল এক ধরণের গর্তবাসী নিশাচর প্রাণী, বৃদ্ধ হলে যাদের মধ্যে জেগে ওঠে কিছু অলৌকিক শক্তি। মুজিনাদের সাথে অনেক সময় তানুকির বর্ণনা মিশে যেতে পারে কারণ এদের দুজনকেই প্রায় একই রকম দেখতে।

স্বভাব-

এরা ইচ্ছাধারী হলেও বাকি অনেক ইচ্ছাধারী প্রেতের মত এদের কাহিনী বিশেষ একটা উপকথায় পাওয়া যায় না। এরা মানুষের গ্রাম থেকে অনেক দূরে পাহাড়ে বসবাস করে আর সচরাচর মানুষের সামনে আসতে চায় না। কিছু মুজিনা মানুষের সাথে মানুষের রূপেই বসবাস করে। তবে এরা কখনোই নিজেদের আসল রূপে মানুষের সামনে আসে না, তাই মানুষের পক্ষেও এদের চেনা খুবই মুশকিল।

মানুষের মুখোমুখি-

গভীর অন্ধাকার রাতে যখন গ্রামের মানুষজন সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন

মুজিনারা মানুষের রূপ ছেড়ে ফিরে আসে এদের আসল রূপে। তারপর এরা এদের প্রিয় রূপ ধরে রাস্তায় নাচ গান করে বেড়ায়। এই রূপটি হল একটি ছোট্ট কিমোনো পরিহিত শিশুর রূপ। সেই সময় কোন মানুষ কাছাকাছি চলে এলে এরা ছুটে পালিয়ে যায় অন্ধাকারের মধ্যে।

৭৮. কিতসুনে

ভাষান্তর- শেয়াল।

অন্যান্য নাম-ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- সর্বভুক।

চেহারা-

জাপানের উপকথায় এমন কিছু দীর্ঘজীবী শেয়ালের কথা পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে নানা অলৌকিক শক্তি। এদের বলা হয় কিতসুনে। এদের কাহিনী পাওয়া যায় সমগ্র জাপানের উপকথায়। এদের দেহটা হয় ছোট আর দেখতেও হয় সাধারণ শেয়ালের মত।

স্বভাব-

সাধারণত এই কিতসুনেদের দুটি শ্রেনী হয়। এক শ্রেনীর কিতসুনেরা বিভিন্ন দেব দেবীর পরিচারক হয়; যেমন শিন্টো দেবতা ইনারি। এই দেবতার মন্দিরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কিতসুনেদের চিত্র বা মূর্তি। উপকথায় কাহিনী অনুযায়ী, এই শ্রেনীর কিতসুনেরা বিভিন্ন সময় মানুষকে বিভিন্ন জিনিস শিখিয়ে সাহায্য করেছে। এরা মানুষকে দান করেছে জ্ঞান আর অর্থ। এরা মাঝে মাঝে ঈশ্বরের দূত হয়ে এসে মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এরা মানব জগতকে রক্ষা করে আর দুষ্ট আত্মাদের দূরীকরণ করে।

এদের অন্য শ্রেণীটি হল দুষ্ট, যারা বিভিন্ন ভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে থাকে।

এরা মানুষের উপর ভর করে তাদের দিয়ে বিভিন্ন গর্হিত কাজ করায়।

কিতসুনেরা প্রচণ্ড চালাক হয়। এরা ইচ্ছে মত যে কোন কিছুই রূপ ধরতেও সক্ষম। তাই এরা মাঝে মাঝে অন্যান্য সব বিরাট দানবের রূপ ধরে মানুষকে ভয় দেখায়। কেউ কেউ মানুষকে শুধুই ভয় দেখিয়ে আনন্দ পায়: কেউ আবার মানুষকে মেরেও ফেলে। এরা সাধারণত সুন্দর নারীর রূপ ধরে পুরুষদের আকৃষ্ট করে। এর ফলে একাধিকবার এদের সাথে মানুষের বিবাহও হয়ে যায়। কিছু কিছু কিতসুনে তাদের জীবনের বেশীরভাগ সময় মানুষের রূপ ধরেই কাটিয়ে দেয়।

মানুষের মুখোমুখি-

এই কিতসুনেদের সম্পর্কে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তার প্রায় বেশীরভাগেই এরা ভণ্ড সন্ন্যাসী, লোভী ব্যবসায়ী অথবা কোন মদ্যপ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছে। এরা বিভিন্ন রকম ভয়ঙ্কর রূপ ধরে আর শব্দ করে সেই মানুষদের ভয় পাইয়ে দেয় আর তারপর তাদের উপর ভর করে তাদের দিয়ে এমন কাজ করায় যাতে তারা জনসমক্ষে অপমানিত হয়। বলা হয় একবার দেহে কিতসুনে প্রবেশ করলে সেই মানুষটির মধ্যে বিভিন্ন মানসিক রোগ দেখা যায়।

৭৯. কিসুনেবি

ভাষান্তর- আগুনে শেয়াল।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- এরা কিতসুনেদের সাথেই থাকে।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

কিসুনেবি হল ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন কিসুনেদের বানানো একটি প্রেত। এদের দেখতে হয় ভাসমান অগ্নি গোলোকের মত, তবে এই গোলোকের ব্যাস হয় মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। আর এরা মাটির মাসান্য উপরেই ভেসে বেড়ায়। এই গোলোকগুলো হয় উজ্জ্বল আর এদের রং হয় লাল কিংবা কমলা। মাঝে মাঝে নীল অথবা সবুজ রঙের অগ্নি গোলোকও দেখা যায়।

স্বভাব-

কিসুনেবি সাধারণত রাতের বেলায় দৃশ্যমান হয়। কখনও কখনও এরা অনেকে একত্রিত হয়ে তৈরি করে কয়েক মাইল লম্বা অগ্নি গোলোকের শৃঙ্খল; যেন একদল অদৃশ্য মানব হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে একাধিক লণ্ঠন। জঙ্গলে বসবাসকারী বৃদ্ধ কিছু শেয়ালের মুখ থেকে রাতের বেলায় নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে এক একটা অগ্নি গোলোক। আর সেই অগ্নিগোলক মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয় কিসুনেবিতে।

মানুষের মুখোমুখি-

কিসুনেবিরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। তবে এদের সাথে ঘুরে বেড়ানো অন্য শেয়াল অনেক সময় মানুষ দেখলে আক্রমণ করে। কখনও কখনও মজা করে এরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আবার কোন কোন সময় এরা মানুষকে পথ ভুলিয়ে কোন ভয়ঙ্কর প্রেতের সামনে এনে ফেলে।

৮০. তানুকি

ভাষান্তর- লোমশ কুকুর।

অন্যান্য নাম-বাকেদানুকি।

আবাস- পাহাড়।

খাদ্য- সর্বভুক; ছোট বড় প্রাণী আর মদ।

চেহারা-

তানুকি হল কিতসুনের মত একটি কুখ্যাত প্রেত। এরা হল এক ধরণের কুকুর আর বেজির মাঝামাঝি একটি প্রাণী। এরা নিশাচর হয় আর সচরাচর মানুষের সামনে আসতে চায় না। এই তানুকিদের কাহিনী পাওয়া যায় সমগ্র জাপানের উপকথায়।

স্বভাব-

তানুকিদের থাকে বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এরাও কিতসুনের মত ইচ্ছেমত যে কোন কিছুর রূপ ধরতে সক্ষম। এরা মানুষের সাথে মজা করলেও তাদের ক্ষতিসাধন করে না। তবে এদের সব থেকে সেরা বৈশিষ্ট্য হল এদের বৃহৎ ঐন্দ্রজালিক অণ্ডকোষ। এদের এই অণ্ডকোষকে এরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেত পারে। কখনও এরা সেটাকে ব্যবহার করে অস্ত্র হিসেবে, আবার কখনও এরা সেটাকে তবলা হিসেবে বাজায়। এরা কখনও সেই অণ্ডকোষকে পাখা বানিয়ে হাওয়া খায় আবার কখনও সেটাকে মাঝধরার জাল হিসেবেও ব্যবহার করে। এরা অন্য কিছুর রূপ ধরার সময় এদের অণ্ডকোষকেও একটা প্রয়োজনীয় রূপ দেয়। এরা দোকানদারের রূপ নিলে এদের অণ্ডকোষ হয় দোকান। আবার এরা পাল্কি বাহকের রূপ নিলে এদের অণ্ডকোষের রূপ হয় পাল্কির।

মানুষের মুখোমুখি-

জাপানের প্রাচীন ধর্মে, এই তানুকিদের দেবতা রূপে পুজো করা হত। এদের মনে করা হত প্রকৃতির দেবতা। পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের পর এদের গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে। তারপর এদের মনে করা হত ঈশ্বরের দূত। এরা মানুষের কাছে বয়ে নিয়ে আসত ঈশ্বরের নির্দেশ।

৮১. বাকেনেকো

ভাষান্তর- রাক্ষুসে বেড়াল।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- মাংসাশী, মাঝে মাঝে মানুষ।

চেহারা-

জাপানী উপকথায় বলা হয় যে যদি কোন বেড়াল অনেক বছর বেঁচে থাকে, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় একাধিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি। এরা তখন পরিবর্তিত হয় এক ভয়ঙ্কর প্রেতে। এদের বলা হয় বাকেনেকো। এই বাকেনেকোদের দেখতে হয় একদম সাধারণ একটি বেড়ালের মত। তবে এরা চার পায়ে হাঁটে না; এরা হাঁটে মানুষের মত পিছনের দুই পায়ে ভয় করে। এদের যত বয়স বাড়তে থাকে, এদের ঐন্দ্রজালিক শক্তিও বাড়তে থাকে। আর তার সাথে বাড়তে থাকে এদের দেহের আকার। একটা সময় এরা প্রায় মানুষের সমান লম্বা হয়ে যায়।

স্বভাব-

বাকেনেকোরা ইচ্ছেমত যে কোন জিনিসের রূপ ধরতে সক্ষম। তবে সাধারণত এরা নিজেদের একটি বেড়ালের রূপেই রেখে দেয়। এই বেড়ালগুলোকে এতটাই সুন্দর দেখতে হয় যে কোন না কোন মানুষ তাদের পোষ্য করে ঘরে নিয়ে যায়। ইচ্ছে হলে এরা সেই মানুষের রূপ ধরে বিভিন্ন কুকাজ করে বেড়ায়। এদের মধ্যে অনেকেই মানুষের মত কথা বলতে পারে। তবে মানুষের রূপ নিলেও এদের চেনার একটা সহজ

উপায় আছে। এরা যে মানুষের রূপই নিক না কেন, এদের মাথায় বাঁধা থাকে একটা গামছা। এরা যখন বাকেনেকোর রূপ ধরে, তখন এরা সর্বত্র নেচে বেড়ায়। এরা বাড়িতে থাকলে সেই বাড়ি উপর নেমে আসে গভীর কালো ছায়া। এদের আকার যেরকমই হোক না কেন, এরা এদের আকারের থেকে অনেক বড় পশুকে খেয়ে নিতে পারে। শুধু তাই হয়, এদের উপর বিষেরও কোন ফল হয় না। বেশ কিছু উপকথায় কাহিনী অনুযায়ী, এই বাকেনেকোরা এদের মালিককে খেয়ে ফেলে আর তারপর সেই মানুষটার রূপ ধরে জীবন অতিবাহিত করে।

যদিও এরা এদের মালিককে মেরে না ফেলে, তাহলে এদের জন্য সেই মানুষটির উপর নেমে আসে কঠিন অভিশাপ। বাকেনেকোরা মন্ত্র পড়ে ডেকে আনতে পারে আগুনেও গোলা আর সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যায় বাড়ি, ঘর ইত্যাদি। তাছাড়া এদের লম্বা লেজ দিয়ে যে কোন দাহ্য জিনিসে এরা আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও এদের আর একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। এরা কোন মানুষকে মেরে ফেললে প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ সেই মৃতদেহ নিয়ে খেলা করে নিজেদের মধ্যে।

৮২. নেকোমাতা

ভাষান্তর- বিড়াল।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- শহর।

খাদ্য- মাংসাশী; মানুষ।

চেহারা-

বাকেনেকো নামক প্রেতের আরও একটা শ্রেণী আছে। তাদের বলা হয় নেকোমাতা। এদের একটার জায়গায় থাকে দুটো ল্যাজ। আর দৃশ্যত এখানেই এরা বাকেনেকোর থেকে আলাদা। অন্যান্য বাকেনেকোর মত নেকোমাতারাও বসবাস করে শহরে বা জনবহুল একালায়। তাছাড়া এদের জন্মও হয় বাকেনেকোদের মত। তবে সব থেকে বৃহৎ আকারের বেড়াল হল অত্যাধিক বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তারা পরিবর্তিত হয় নেকোমাতায়। আর যখন এরা নেকোমাতায় পরিবর্তিত হয়, তখন এদের ল্যাজটা দুই ভাগে ভাগ করে যায়। এরা মানুষের মত দুই পায়ে ভর করে হাঁটতে পারে আর মানুষের ভাষায় কথাও বলতে পারে।

স্বভাব-

সব বাকেনেকোরা তাদের মালিকদের আক্রমণ না করলেও, এই নেকোমাতারা তাদের মালিকদের আক্রমণ করে। এরা মানুষকে ঘৃণা করে। এরাও বাকেনেকোর মত আগুনের গোলাকে ডেকে আনে আর সেই আগুনে জ্বালিয়ে দেয় একাধিক বাড়ি ঘর। এদের আর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এটা মৃতদেহদের চালনা করতে পারে। আর এই

মৃতদেহ দিয়ে এরা মানুষের উপর আক্রমণ করে।

সব থেকে শক্তিশালী নেকোমাতারা বসবাস করে দুর্গম পাহাড়ের গুহায়। এখানে এরা চিতা অথবা বনবিড়ালের রূপ ধরে থাকে। এদের আকার হয় বিরাট আর এদের খাদ্য হয় বিভিন্ন পশু। এছাড়াও সুযোগ পেলেই এরা মানুষ শিকার করে খেতে ভালোবাসে।

৮৩. আও ন্যোবো

ভাষান্তর- নীল রঙের যুবতী।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- পরিত্যক্ত প্রাসাদ, বাড়ি, ভগ্নাবশেষ।

খাদ্য- পচা খাবার; মানুষ।

চেহারা-

বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত কোন প্রাসাদে শুধু ধুলো আর মাকড়শার জালই থাকে না, মাঝে মাঝে এই সব স্থানে বাসা বাঁধে আও ন্যোবো নামক এক ভয়ঙ্কর প্রেত। এরা দারিদ্র আর দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে। এরা প্রাচীন কালের ধনী পরিবারের নারীদের মত পোশাক পরে থাকে। এদের পরনে থাকে দামী রঙীন কিমোনো। তবে এই কিমোনোর পায়ের কাছের দিকটা হয় ছেঁড়া বা জরাজীর্ণ। এদের মুখের রং হয় সাদা আর এদের দাঁত হয় কুচকুচে কালো। এদের মুখে থাকে একাধিক বলিরেখা।

স্বভাব-

আও ন্যোবোরা বসবাস করে প্রাচীন কালের কোন পরিত্যক্ত প্রাসাদে। এরা সেই প্রাসাদের মধ্যেই অপেক্ষা করে থাকে। সময় সময় এরা সুন্দর করে সাজে, চুল বেঁধে নিজদের সুন্দর করে রাখতে চায়। তারা এমন ভাবে ব্যবহার করে যেন তারা কোন এক প্রিয় অতিথির জন্য অপেক্ষা করছে। তবে সেই বাড়িতে কোন মানুষ প্রবেশ করলে এই আও ন্যোবো তাকে খেয়ে ফেলে।

৮৪. কাগে ওন্না

ভাষান্তর- ছায়া মানবী।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- পরিত্যক্ত বাড়ি।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

কাগে ওন্না হল এক শ্রেনীর প্রেত যাদের নিজেদের কোন দেহ নেই। এরা ছায়া হয়ে বাড়ির জানলায় বা দরজায় আসে যখন সেই বাড়িতে কোন লোক থাকে না। এদের নিজেদের দেহ না থাকলেও এরা সাধারণত কোন সুন্দর নারীর রূপ ধরে থাকে। মাঝে মাঝে এরা বৃদ্ধার রূপ ধরেও থাকে, তবে সেই বৃদ্ধা গলা থেকে ঝুলতে থাকে একটা বড় ঘণ্টা। এরা গভীর রাতেই বাইরে বের হয়, বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে। সেই চাঁদের আলোয় এদের ছায়া দেখা যায় বাড়ির কাগজের দরজা আর জানলায়।

স্বভাব-

কাগে ওন্নারা কোন রকম শব্দ করে না, এরা মানুষের সাথে কথাও বলতে অক্ষম। এরা শুধু নিজেদের ছায়া প্রদর্শন করা ছাড়া মানুষের কোন ক্ষতি করে না। তবে এই ছায়া দেখে মানুষ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। তবে কেউ যদি সাহস করে দরজা বা জানলা খুলে ছায়ার মালিককে দেখতে চায়, তাহলে তাদের নজরে আসে শুধুই গাঢ় অন্ধকার।

৮৫. নুরেবোতোকে

ভাষান্তর- ঢাকা বুদ্ধ।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- পরিত্যক্ত বাড়ি।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

নুরেবোতোকে হল এক ধরণের কুৎসিত প্রেত অনেকটা ইংরেজি সিনেমার জম্বির মত। রাতে যদি ভুলবশত কেউ চিলেকোঠার দরজা খোলা রাখে, তাহলে এরা সেই চিলেকোঠা থেকে নেমে আসে রাতের অন্ধকারে। এদের দেহ হয় নরম আর মৃতদেহের মত। তবে এদের দেহের রং হয় কালো। এছাড়াও এদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে একটা পচা গন্ধ। এদের পিছন থেকে বেরিয়ে থাকে একটা লম্বা ল্যাজ। তবে সব থেকে কুৎসিত হল এদের চোখ। এদের চোখ দুটো চক্ষু গহ্বরের বাইরে ঝুলতে থাকে।

মানুষের মুখোমুখি-

নুরেবোতোকে বিশেষ কিছু করে না। এরা শুধু ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়ায় আর মাটিতে ল্যাজ দিয়ে বাড়ি মারে। এদের দর্শনেই বাড়ির মানুষেরা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। এরা মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে নেচেও বেড়ায়। তবে এরা মাঝে মাঝে মানুষকে মিথ্যা ভবিষ্যৎ বলে বোকাও বানাতে পারে। বলা হয় ঘরের মধ্যে বা চিলেকোঠার বাইরে নুন ছড়িয়ে রাখলে নুরেবোতোকেরা সেখান থেকে বেরোতে পারে না। এরা সকাল হওয়ার আগে আবার চিলেকোঠায় ফিরে যায় আর দিনের বেলায় অদৃশ্য হয়ে থাকে।

৮৬. জাশিকি ওয়ারাশি

ভাষান্তর- জাশিকি শিশু।

অন্যান্য নাম- একাধিক।

আবাস- জাশিকি (এক ধরণের জাপানী কার্পেট পাতা ঘর)।

খাদ্য- নেই, তবে মিষ্টি খেতে ভালোবাসে।

চেহারা-

জাশিকি ওয়ারাশি হল একধরণের প্রেত যারা মানুষের বাড়িতে বসবাস করে। এরা মানুষের সাথে মজা করতে ভালো আসে আর এদের দুরাত্মা হিসেবে দেখা হয় না। বলা হয় এরা বাড়িতে থাকলে সেই বাড়িতে নেমে আসে সৌভাগ্য। সেই বাড়ির মালিকের প্রাপ্তি হয় বিপুল ধন সম্পত্তি। তবে এদের সরাসরি দেখা খুব একটা যায় না। তাই এদের সেরকম বর্ণনাও নেই। বলা হয় এদের দেহটা একটা অস্পষ্ট পর্দার মত। আর এদের আকার হয় একজন মানব শিশুর মত। তবে মাঝে মাঝে এদের দেখা পাওয়া যায়। তখন এদের দেখতে হয় একজন পাঁচ-ছ বছরের মানব শিশুর মত যার মুখের রং হয় লাল। পুরুষ জাশিকি ওয়ারাশিদের পরনে থাকে যোদ্ধাদের পোশাক আর নারী জাশিকি ওয়ারাশিরা পরে থাকে রঙীন কিমোনো। বলা হয় শুধু বাড়ির মালিক আর বাড়তে বসবাসকারী শিশুরাই এদের দেখতে পায়।

স্বভাব-

জাশিকি ওয়ারাশিরা মজা করতে ভালোবাসে। এরা যে বাড়িতে থাকে সেখানে মাঝে মাঝে দেখা যায় সাবানের ফেনা ওয়ালা বাচ্চাদের পদচিহ্ন। এছাড়াও এরা রাতের

বেলা অদ্ভুত সব ধব্দ করে। সাধারণত একটি বাড়িতে একটিই জাশিকি ওয়ারাশি বসবাস করে।

মানুষের মুখোমুখি-

জাশিকি ওয়ারাশিদের বলা হয় বাড়ির রক্ষাকর্তা। এরা বাড়ির লোকেদের জন্য নিয়ে আসে সৌভাগ্য। বলা হয় যে বাড়িতে জাশিকি ওয়ারাশিরা থাকে সেই বাড়ির মালিক ধীরে ধীরে ধনী হয়ে ওঠে। আর যে বাড়ি থেকে এদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই বাড়ির উপর নেমে আসে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ।

একটি কাহিনী অনুযায়ী, একবার এক গৃহকর্তা দেখেন যে তার বাড়ি থেকে একটি জাশিকি ওয়ারাশি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। এই ঘটনার পরের দিনই পরিবারের সকলে বিষ মেশানো খাবার খেয়ে মারা যায়।

একাধিক বাড়িতে বসবাসের সময় জাশিকি ওয়ারাশিরা সেই বাড়ির শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এরা শিশুদের শিখিয়ে দেয় বিভিন্ন খেলা আর গান। এরা মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকে বৃদ্ধ দম্পতির সাথে কথা বলে তাদের একাকীত্ব দূর করে। সন্তানহীন দম্পতির কাছে এরা থাকে সন্তানের মত।

৮৭. উসুৎসুকি ওয়ারাশি

ভাষান্তর- হামানদিস্তে পেশা শিশু।

অন্যান্য নাম- নোটাবারিকো।

আবাস- গুদাম।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

এদের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এদের মুখ থেকে বেরোনো হামান দিস্তে পেষার মত ভয়ানক শব্দ হয়। এরা খুব নীচু শ্রেনীর প্রেত।

স্বভাব-

এরা রাতের বেলায় গুদামের ছাদের ময়লা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর নীচে নেমে সারা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এরা ভয়ঙ্কর কিছু শব্দ করে আর মাটিতে রেখে যায় এদের নোংরা মাখা পায়ের চিহ্ন। উসুৎসুকি ওয়ারাশিরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। তবে এরা যেখানে বসবাস করে সেই স্থানটি মানুষের বসবাসের জন্য অযোগ্য হয়ে ওঠে। এরা গুদামে বা ঘরে থাকলে সেই স্থানে কোন শুভ কাজ হয় না। তবে কেউ যদি কোন গুদাম বা ঘর থেকে এদের বের করে দেয়, তাহলেও সেই বাড়ির ভালো কিছু হয় না। কিছু দিনের মধ্যেই সেই গুদাম বা বাড়ি ভেঙে পড়ে।

এই উসুৎসুকি ওয়ারাশিদের উৎপত্তির পিছনেও আছে সেই প্রাচীন জাপানের দুর্ভিক্ষ পিড়ীত সময়ের কথা। কোন কোন পরিবার এই দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য

নিজেদের পরিবারের সদ্য জন্মানো শিশুকে হত্যা করত, যাতে তার ভাগের সামান্য খাবারটাও পরিবারের বাকিরা খেয়ে বেঁচে থাকে। তারপর সেই সদ্যজাতটির মৃতদেহ পুথে দেওয়া হল গুদাম ঘরের নীচে। এই সব শিশুদের আত্মাই আসলে উসুৎসুকি ওয়ারাশি।



আকানামে

৮৮. আকানামে

ভাষান্তর- নোংরা খেকো।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- নোংরা স্নানঘর।

খাদ্য- মানুষের চুল, নোংরা, মল মুত্র।

চেহারা-

আকানামে হল এক ধরণের বেঁটে প্রেত যাদের বাসস্থান হল নোংরা স্নানঘর আর বাথরুম। এরা উচ্চতায় একটি মানব শিশুর মত হয় তবে ঝুঁকে হাঁটার কারণে এদের আরও বেঁটে মনে হয়। এদের মাথায় থাকে নোংরা একটা ঝাঁটা। এদের পরনে কোন পোশাক থাকে না আর এদের চামড়াটা হয় তেলতেলে। এদের দেহের রং হয় ভিন্ন; কারুর রং হয় সবুজ, আবার কারুর রং হয় লাল। কোন কোন আকানামের একটা মাত্র চোখ থাকে আবার কারুর থাকে দুটো চোখ। এদের হাত আর পায়ের আঙুলের সংখ্যা হয় ভিন্ন। এদের আর একটা বিশিষ্ট হল এদের লম্বা জিহ্বা। এই জিহ্বার সাহায্যে এরা বাথরুমের মাটি থেকে চেটে খায় নোংরা আর ঝরে পড়া মানুষের চুল।

স্বভাব-

আকানামে কোন বাড়িতে থাকলে সেই বাড়ির বাথরুম হয় ঝকঝকে পরিষ্কার। এরা সেইসব মানুষের বাড়িতেই থাকে যারা অপরিষ্কার থাকতে ভালোবাসে। এরা পরিষ্কার বাড়ির মালিকদের দেখলে অন্ধকারে মিশে যায়।

৮৯. কেউকেজেন

ভাষান্তর- লোমশ দৃষ্টি।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- নোংরা বাগান, নোংরা আলমারি।

খাদ্য- মাটি, ময়লা।

চেহারা-

কেউকেজেন হল এক ধরনের দানব যারা জনবহুল স্থানে বসবাস করে। এদের আকার হয় একটি ছোট্ট কুকুরের মত যাদের দেহ থাকে লম্বা নোংরা লোমে পরিপূর্ণ। এরা বসবাস করে ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে। এরা বিশেষ করে সেই সব স্থান বেছে নেয় যেখানে মানুষ বসবাস করে না আর সেই মানবহীন স্থানে এরা জন্ম দেয় বিভিন্ন রোগের।

স্বভাব-

এদের দেখতে খুব একটা ভয়ঙ্কর না হলেও এরা কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে আসতে পছন্দ করে না। এরা দুর্ভাগ্য আর অসুখের বহনকারী। এদের কাছাকাছি কোন মানুষ এলে সেই মানুষের উপর নেমে আসে বিভিন্ন কঠিন অসুখ। এরা সাধারণত মানুষের কাছাকাছি আসে না বলে এদের দেখেছে এমন মানুষের সংখ্যাও খুব কম। তবে এরা কোন বাড়ির নীচের স্যাঁতস্যাঁতে কুঠুরিতে বাসা করলে সেই বাড়ির মানুষরা হঠাৎ করে অসুস্থ হতে শুরু করে আর তার সাথে তাদের দিকে ধেয়ে আসে দুর্ভাগ্য। এদের থেকে দূরে থাকার এক মাত্র উপায় হল বাড়ি পরিষ্কার রাখা।

৯০. কামিকিরি

ভাষান্তর- নাপিত।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- অন্ধকার স্নানঘর, অন্ধকার গলি, শোবার ঘর।

খাদ্য- মানুষের চুল।

চেহারা-

কামিকিরি হল এক ধরণের অদ্ভুত জীব যাদের দেখতে অনেকটা পোকার মত তবে এদের পাখির মত ঠোঁট থাকে। আর এই ঠোঁটটা হয় কাঁচির মত। এদের হাত পা গুলো হয় ধারালো ক্ষুর-এর মত। এরা আকারে খুবই ছোট হওয়ার ফলে সহজেই মানুষের অজান্তে তাদের বাড়িতে ঢুকে যায়।

স্বভাব-

কামিকিরিদের কাজই হল রাতের বালায় ঘুমন্ত মানুষের চুল কেটে নেওয়া। এরা ছাদের এক কোণে এমন ভাবে লুকিয়ে বসে থাকে, যে মানুষের এদের উপস্থিতি টেরই পায় না। এরা তারপর আস্তে আস্তে এসে পুরুষ নারী নির্বিশেষে মানুষের চুল কেটে দেয়। কামিকিরিরা সাধারণত শহরেই বসবাস করে আর শহুরে মানুষদেরই আক্রমণ করে। এরা বিভিন্ন অন্ধকার গলি, এমনকি মানুষের ব্যবহারযোগ্য স্নানঘরেও লুকিয়ে থাকে। বেশিভাগ সময় এরা যে আক্রমণ করেছে সেটা মানুষ বুঝতেই পারে না, তবে পরে ঘরের মধ্যে এক গাছে কেটে নেওয়া চুল দেখে তারা বুঝতে পারে। এরা সাধারণত সেই সব মানুষদের আক্রমণ করে যাদের মাথায় লম্বা চুল থাকে।

শুধু চুল কেটে দেওয়াই নয়, এই কামাকিরির আক্রমণের হল একটি সংকেত যে মানুষটির সাথে খুব শিগগিরি কোন প্রেতের বিবাহ হবে। যেহেতু প্রেতের সাথে মানুষের বিবাহ কখনওই সুখী হয় না, তাই কামাকিরিরা মানুষকে সেটা জানান দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টাও করে।

৯১. সেতো তাইশো

ভাষান্তর- সেনাধ্যক্ষ সেতো।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- জানা নেই।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

বাড়ির ভাঙা কাপ, বাটি বা থালা থেকে বিভিন্ন টুকরো একত্রিত হয়ে তৈরী হয় সেতো তাইশো নামক এই প্রেত যোদ্ধা। এদের মুখটা হয় বোতোলের মত আর এদের দেহটা হয় পোরসেলিন-এর। এরা রান্নাঘরে ছুটে বেড়ায় আর এদের হাতে থাকে ছুরি, চামচ বা চপস্টিক যেগুলোকে এরা বর্শা আর তলোয়ারের মত ব্যবহার করে।

স্বভাব-

সেতো তাইশোরা খুবই হিংস্র প্রকৃতির হয়। এরা রাঁধুনিদের ছুরি হাতে তাড়া করতে খুবই ভালোবাসে। যার ফলে রান্নাঘর জুড়ে শুরু হয় একটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা। মাঝে মাঝে এরা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে আবার সেই টুকরো জোড়া লেগে এরা ফিরে আসে নিজের আগের রূপে।

৯২. শিরো উনেরি

ভাষান্তর- সাদা ন্যাতা।

অন্যান্য নাম-নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

রান্নাঘরে ব্যবহৃত তোয়ালে বা ন্যাতা বহুদিন যাবত ব্যবহার করলে সেই কাপড়ের টুকরোটা ক্রুদ্ধ হয়ে পরিবর্তিত হয় একটা প্রেতে। এদের বলা হয় শিরো উনেরি।

স্বভাব-

শিরো উনেরি ইচ্ছে মত বাতাসে উড়ে বেড়ায় আর বাড়ির চাকরদের তাড়া করে। এরা এদের চটচটে শরীর দিয়ে মানুষের গলা পেচিয়ে ধরে আর টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে এদের চাপে সেই মানুষটি সংজ্ঞা হারায়। এরা যদিও মানুষকে মারার জন্য তাদের গলা চেপে ধরে না, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এদের হাতে মারা পড়ে বাড়ির পরিচারকেরা।

৯৩. বাকেজোরি

ভাষান্তর- ভৌতিক জুতো।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

যখন কোন কাঠের বা খড়ের তৈরি জুতোকে তার মালিক ব্যবহার করে ফেলে রাখে অথবে দুর্ব্যবহার করে, তখন সেই জুতোগুলো পরিবর্তিত হয় এক ধরণের প্রেতে। এদের বলা হয় বাকেজোরি।

স্বভাব-

একবার বাকেজোরিতে পরিবর্তিত হলে সেই জুতোদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসে এক জোড়া হাত আর এক জোড়া পা। আর মাঝখানে থাকে একটা মাত্র চোখ। এরা তখন রাতের বেলায় সারা বাড়িতে ছুটোছুটি করে আর বিভিন্ন রকম শব্দ করে মানুষকে ভয় দেখায়। এরা ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়ানোর সময় সুর করে পড়তে থাকে একটা অদ্ভুত কবিতা, ''কারারিন! কারারিন! তিনটে চোখ আর দুটো দাঁত!''

এখানে তিনটে চোখ বলতে জুতোর ফিতে লাগানর তিনটে ফুটোকে বোঝানো হয়েছে আর দুটো দাঁত হল জাপানী জুতোর তলায় থাকা দুটো হিল।

৯৪. কারাকাসা কোজো

ভাষান্তর- কাগজের ছাতা।

অন্যান্য নাম-কাসা ওবাকে, কারাকাসা ওবাকে।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

কারাকাসা কোজো হল কাগজের ছাতারূপী একটি প্রেত। এদের থাকে একটা বড় গোলাকার চোখ আর একটা লম্বা জিহ্বা। ছাতার বাঁটের থেকে বেরিয়ে থাকে একটা বা দুটো পা।

স্বভাব-

কারাকাসা কোজো একটি শান্ত প্রকৃতির প্রেত। এরা সাধারণত মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এরা লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষের সামনে এদের এদের লম্বা জিভ দিয়ে তাদের চেটে দেয়। এটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হলে ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা। এরা শান্ত প্রকৃতির হলেও অন্য অনেক ছাতারূপী ভয়ঙ্কর প্রেতের কথা পাওয়া যায় জাপানী উপকথায়। তাই এদের সাথে তাদের গুলিয়ে ফেললেই মুশকিল।

৯৫. মোকুমোকুরেন

ভাষান্তর- একাধিক চোখ।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

জাপানের প্রাচীন বাড়িতে দরজা বা জানলা তৈরি হত কাগজ দিয়ে। এদের বলা হত শোজি। সেই দরজা জানলা সময় মত মেরামত না করলে তার মধ্যে দেখা দিত একাধিক ছিদ্র। এই শোজিদের যদি বহুদিন ফেলে রাখা হয়, তাহলে এদের মধ্যে জন্ম নেয় একাধিক ভৌতিক চোখ। প্রতিটি ছিদ্রতে জন্ম নেয় একটি করে চোখ আর সেই চোখ দেখতে থাকে বাড়ির ভিতরের সব কিছু।

স্বভাব-

মোকুকোকুরেন আদতে ক্ষতিকর না হলেও এদের দেখতে হয় ভীষণ ভয়ঙ্কর। এরা কখনও একা থাকে না। এদের সঙ্গে সব সময় থাকে অন্য কোন একটি প্রেত। এরা নিজেরা শান্ত প্রকৃতির হলেও এদের সঙ্গী প্রেতটি ভয়ঙ্করও হতে পারে।

৯৬. চোচিন ওবাকে

ভাষান্তর- কাগজের লন্ঠন।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

যখন একটি কাগজের লন্ঠন বা চোচিন অনেক পুরানো হয়ে যায়, তখন সেই 'বয়স্ক' লন্ঠন পরিবর্তিত হয় চোচিন ওবাকে নামক এক প্রেতে। এই লণ্ঠনের কাগজ ছিঁড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে একটা মুখ গহ্বর আর সেই মুখ থেকে বেরিয়ে থাকে একটা লম্বা জিহ্বা। এদের উপরের দিকে একটা বা দুটি চোখও থাকে। কোন কোন চোচিন ওবাকের হাত আর পাও দেখা যায়। তবে হাত পা ওয়ালা চোচিন ওবাকে খুবই বিরল।

স্বভাব-

অন্যান্য কিছু প্রেতের মত, চোচিন ওবাকে মানুষের ক্ষতিসাধন খুব একটা করে না। তবে এরা মানুষকে ভয় দেখাতে খুবই ভালোবাসে। এরা এদের বড় বড় চোখ আর লম্বা জিহ্বা বের করে বাড়িতে আসা অতিথিকে ভয় দেখায়।

৯৭. ক্যোরিনরিন

ভাষান্তর- অবাক করা সূত্র।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- নেই।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

ক্যোরিনরিন হল প্রাচীন পুঁথি বা স্ক্রোল থেকে জন্ম নেওয়া একটি পবিত্র জ্ঞানী প্রেত। এরা সেই সব পুঁথি থেকে জন্ম নেয় যেগুলো বহুদিন না পড়ে ফেলে রাখা হয়েছে আর ধীরে ধীরে সময়ের ধুলো জমে গেছে তাদের উপর। এদের পরনে থাকে প্রাচীন পুঁথির পাতা অথবা স্ক্রোল যেগুলো এরা কিমোনোর মত করে পড়ে থাকে। এদের মাথায় মুকুটের মত করে পরা থাকে একটা রঙিন স্ক্রোল। এছাড়াও এদের লম্বা লম্বা হাত আর পাখির মত লম্বা বাঁকানো ঠোঁট থাকে।

স্বভাব-

বহুযুগের প্রাচীন জ্ঞান থেকে তৈরি ক্যোরিনরিন ড্রাগন আত্মার মত পবিত্র। তবে যারা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে রাখে কিন্তু সেগুলো পড়ে না, এরা এদের লম্বা হাত দিয়ে সেরকম মানুষকে আক্রমণ করে।

৯৮. সুজুরি নো তামাশি

ভাষান্তর- ছাপায় পাথরের ভূত।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- সর্বত্র।

খাদ্য- নেই।

চেহারা-

প্রাচীন কালে পুঁথি বা বই নকল করার জন্য একধরণের পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে কালী লাগিয়ে একটি পুঁথির পাতার অবিকল ছাপ তুলে নেওয়া হত আর এই ভাবেই সেই পুঁথিটির আরও নকল বানানো হত। এই পুঁথি নকলের পাথর যদি প্রায় একশো বছরের বেশি থেকে যায়, তাহলে এরা পরিবর্তিত হয় সুজুরি নো তামাশি নামক একটি প্রেতে। এরা অদ্ভুত সব শব্দ করতে পারে আর ইচ্ছেমত এদের দেহ থেকে যে কোন একটি অক্ষরকে জীবন্ত করে দিতে পারে। তারপর সেই অক্ষরটি সারা বাড়িতে ঘুরে ঘুরে জিনিস নষ্ট করতে থাকে।

স্বভাব-

প্রাচীন কালে জাপানের উপকথার একটি প্রচলিত ঘটনা ছিল তাইরা আর মিনামোটো জাতির মধ্যে বাঁধা গৃহযুদ্ধ, যার নাম ছিল গেনপেই যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শেষে সম্পূর্ণ তাইরা জাতিকে হত্যা করে মিনামোটো জাতির লোকেরা। সেই সব মৃত তাইরা যোদ্ধাদের আত্মা প্রেত রূপে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর বুকে। আর সেই কাহিনী নকল করার জন্য যে সব পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই পাথরের মধ্যে ঢুকে এরা সেই পাথরটিকে

পরিবর্তিত করে সুজুরি নো তামাশিতে।

সুজুরি নো তামাশিরা সেই যুদ্ধে মারা যাওয়া যোদ্ধাদের কাহিনী চিৎকার করে বলতে থাকে। এদের কাছাকাছি কোন মানুষ গেলেই এরা বিভিন্ন ধরণের শব্দ করে সেই মানুষটিকে ভয় দেখায়। এই পাথরে লেগে থাকা কালি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ওঠা নামা করে আর সেই ঢেউ থেকে জন্ম নেয় সেই সব মৃত যোদ্ধাদের প্রেত।

৯৯. কোসোডে নো তে

ভাষান্তর- হাতকাটা কিমোনো হাত।

অন্যান্য নাম- নেই।

আবাস- বিশেষ করে পতিতাপল্লীতে।

খাদ্য- জানা নেই।

চেহারা-

কোসোডে নো তে হল এক ধরণের অদ্ভুত প্রেত যাদের দেহটা হয় একটা হাতকাটা কিমোনোর মত। বলা হয় এই ছোট কিমনোগুলো কোন পতিতার পরিত্যক্ত। এই কিমোনোগুলোর কাছাকাছি কোন মানুষ এলেই এর ভীতর থেকে বেরিয়ে আসে এক জোড়া হাত আর সেই মানুষটিকে আক্রমণ করে।

উপকথায়-

কোসোডে নো তে-দের জন্ম হয় একাধিক কারণে। সব থেকে প্রচলিত হল- যখন কোন পতিতার বহু বছর পতিতাবৃত্তি করার পরেও নিজের স্বাধীনতা কেনার মত টাকা জোগাড় করতে না পেরে মারা যায়, তখন তাদের ব্যবহৃত পোশাক মন্দিরে দান করা হয় যাতে সেই দানের বিনিময়ে সেই পতিতাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে মন্দিরের পুরোহিতরা। আর যদি সেই মৃত পতিতাটির কাছে কোন মানুষের ধার থাকত, তখন সেই পতিতার আত্মা তার পুরানো পোশাকের মধ্যে ঢুকে জন্ম দিত কোসোডে নো তে-র। তখন কোসোডে নো তে মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে যেত সেই সব মানুষের কাছে যার থেকে জীবিত কালে সেই পতিতাটি টাকা পেত। তারপর বিভিন্ন ভাবে সেই

মানুষটিকে এরা ভয় দেখায়।

আর একটি কাহিনী অনুযায়ী, যখন কোন মৃত মানুষের কিমোনো মন্দিরে দান না করে বিক্রি করে দেওয়া হয়, তখন সেই মানুষের আত্মা এদের ঢুকে যায় সেই কিমোনোর মধ্যে আর জন্ম দেয় কোসোডে নো তে-র।

১০০. আও আন্দোন

ভাষান্তর- নীল লন্ঠন।

অন্যান্য নাম- আও আন্ডো।

আবাস- মানুষের বসার ঘরে।

খাদ্য-ভয়।

চেহারা-

আও আন্দোনদের জন্ম হয় একধিক মানুষের মনের ভয় থেকে। এই ভয় আস্তে আস্তে বড় হয়ে আকার ধারণ করে একটা দানবীর। এদের মাথায় থাকে লম্বা কালো চুল, চামড়ার রং হয় নীল, কালো দাঁত, মাথায় থাকে বাঁকানো শিং। এদের মুখের মধ্যে থাকে একাধিক ছুঁচলো দাঁত। এদের পরনে থাকে সাদা অথবা নীল রঙের কিমোনো (জাপানী পোশাক) আর এদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয় নীল আলো।

এডো সাম্রাজ্যের সময়, তৎকালীন মানুষদের একটা জনপ্রিয় অভ্যাস ছিল রাতের বেলায় একসাথে জড়ো হয়ে ভূতের গল্প করা। এই ধরনের জমায়েতকে বলা হত হ্যাকুমোনোগাতারি কাইদাঙ্কাই। যার বাংলা মানে হয় একশো ভূতের কাহিনীর জমায়েত। এই আড্ডার সময়, একশোটি মোমবাতি জ্বালানো হত আর সেগুলো রাখা হত নীল রঙের কাগজের লণ্ঠনের মধ্যে। এই লন্ঠনদের বলা হত অন্দোন। প্রতিটি কাহিনী শেষ হলে একটি করে মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়া হত। যার ফলে ঘরের মধ্যে আলো কমে যেত। বলা হত, শেষ মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলে এত লোকের ভয় থেকে জন্ম নিত এক ভয়ঙ্কর প্রেত যে সেই জমায়েতের মধ্যে একজনকে আক্রমণ করত। এই প্রেতদের বলা হয় আও অন্দোন।

স্বভাব-

বলা হয় শেষ মোমবাতিটা নিভে গেলে তার ধোঁয়া থেকে জন্ম নেয় আও অন্দোন আর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে আসরের একজনকে। কোন কোন উপকথা অনুযায়ী, এই আও অন্দোন সেই জমায়েতের সব মানুষকেই মেরে ফেলত। আবার অনু কাহিনী অনুযায়ী, এরা সবাইকে ভয় দেখিয়ে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। যার ফলে সেই সময়ের হ্যাকুমোনোগাতারি কাইদাঙ্কাই নামক আসরগুলো শেষ করে দেওয়া হত নিরানব্বইটা কাহিনীর পরেই। কেউ সেখানে একশোতম কাহিনীটা আর বলত না।

REFERENCES AND FURTHER READING BOOKS

1) Hearn, Lafcadio. In Ghostly Japan. Boston: Little, Brown, and Co., 1899.

2) Hearn, Lafcadio. Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things. Boston: Houghton, Mifflin and Co., 1904.

3) Foster, Michael Dylan. Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yokai. Los Angeles: University of California Press, 2009.

4) Griffis, William Elliot. Japanese Fairy World. Stories from the Wonder-lore of Japan. London: Trübner & Co., 1887.

5) Mitford, A.B. Tales of Old Japan. London, 1871 Mizuki, Shigeru. Mujara. Tokyo: Softgarage Inc., 2008.

Ozaki, Yei Theodora. Japanese Fairy Tales. New York: A.L. Burt Company, 1908.

6) Sawaki, Sushi. Hyakkai zukan. 1737. Toriyama, Sekien. Gazu hyakki yagyo. 1776.

7) Toriyama, Sekien. Konjaku gazu zoku hyakki. 1779. Toriyama, Sekien. Konjaku hyakki shui. 1780.

Toriyama, Sekien. Gazu hyakki tsurezure bukuro. 1784.

8) Yodo, Hiroko and Matt Alt. Yokai Attack! The Japanese Monster Survival Guide. Tokyo: Kodansha International Ltd., 2008.

ONLINE

1) atelier CROMAGNON. <http://www.cromagnon.jp>

2) Database of Images of Strange Phenomena and Yokai. International Research Center for Japanese Studies. <http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiGazouMenu/>.

3) Folktale Data of Strange Phenomena and Yokai. International Research Center for Japanese Studies. <http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiDB/>.



অভিষেক মিত্র পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং নেশায় লেখক। কলকাতার কাছেই বাটানগর নামক ছোট্ট মফঃস্বলে কেটেছে তাঁর শৈশব এবং কৈশোর। স্কুল-কলেজে পড়াকালীনই একাধিক নামী-অনামী পত্র-পত্রিকায় ছেপে বেরোয় তাঁর লেখা গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ। 'আগুন নিয়ে খেলা' (কবিতা), 'পৃথিবীর কবিতা' (অনুবাদ), 'ভয় এবং' (ছোটগল্প), 'The Lost Weapon' (ইংরাজি উপন্যাসিকা) হল তাঁর প্রকাশিত কিছু বই।

২০২১ সালের কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে দেশ-বিদেশের উপকথায় বর্ণিত ভূত-প্রেত-পিশাচ বা আরবান লেজেন্ডদের বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই 'দেশ-বিদেশের ভূত'। বইটি পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই 'কোডেক্স ইয়োকাই' বইটির বিষয়বস্তু হল, জাপানের উপকথায় বর্ণিত বিভিন্ন ভূত-পিশাচের বর্ণনা।

আশা করা যায় এই বইটিও পাঠকদের মনের খোরাক জোগাতে সক্ষম হবে এবং তাদের কৌতূহলী মন একটু ভিন্নমাত্রার রসদ পাবে।



CODEX YOKAI
By Avishek Mitra
₹ 280.00

ISBN : 978-93-94254-20-6
9 789394 254206
www.PalokPublishers.com